কুড়িগ্রাম জেলা

নাদুর লাশ পড়ে রইল চরের মধ্যেই

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় চিলমারী থানায় ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। আমার দাদুর বয়স তখন ১৮-১৯ বছর। উনি সবেমাত্র এসএসসি পাস করেছেন। ছাত্রাবস্থায় থানার সাথে দাদুর বেশ পরিচিতি ছিল। এলাকায় ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়েছে। বিভিন্ন গ্রামে পাকবাহিনী আগুন ধরিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। দাদুর গ্রামের লোকজন গ্রাম থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল। এমন সময় একদিন বিকেল বেলা থানা থেকে পাকবাহিনীর কিছু সদস্য এসে বলল, তোমাদের কোনো ভয় নেই। তোমরা কোথাও যেও না, আমরা তো আছি। আরও বলল, আজ দুপুরে তোমরা সবাই আমাদের থানা ক্যাম্পে এসো, বড় বাবু তোমাদের সাথে কথা বলবেন।

আগে থেকে বড় বাবুর সাথে পরিচয় থাকায় গ্রামের লোকজন নির্ভয়ে দুপুরে থানা ক্যাম্পে গেল। থানা ক্যাম্পে যাওয়ার পর দেখা গেল অন্যরকম পরিস্থিতি। অনেক পাকসেনা সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে। যাওয়ার সাথে সাথে তারা বলল, আসেন, বড় বাবু আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

ভেতরে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের আটকে দেওয়া হলো। বলল, তোমরা সবাই মুক্তিবাহিনীতে নাম দিয়েছ। তাই তোমরা এখান থেকে জীবিত অবস্থায় যেতে পারবে না। দাদুরা সংখ্যায় ছিলেন ৩৭ জন। তারা সবাই চিলমারী থানায় আটক হলেন। ৩৭ জনের মধ্যে ১১ জন ছিলেন মুসলমান। ঝাকুর গ্রামে এ সংবাদ শোনামাত্র সবাই কান্নায় ভেঙে পড়ল। তারা যার যা আছে তাই নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে লাগল।

আমার দুই জন মামার মধ্যে বড় মামার বড় ছেলের নাম 'নাদু'। নাদু দেখতে বেশ নাদুস নুদুস ছিল। নাদুর বয়স তখন ৭-৮ বছর হবে। নাদু যখন শুনল তার কাকু থানা ক্যাম্পে ধরা পড়েছে, সে তখন থানা ক্যাম্পে কাকুকে দেখার জন্য গিয়েছে। ইতিমধ্যে আটককৃত সব লোককে কোমরে রশি বেঁধে ব্রহ্মপুত্র নদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে মারার জন্য। পথে নাদুকে দেখে দুই দাদু ভীষণভাবে কাঁদল। নাদু তার বাবা এবং কাকুর নিকট এলো। সাথে সাথে পাকবাহিনী নাদুকে ধরে ফেলল।

ব্রহ্মপুত্র নদের চরে কাশের গাছ চৌকোণা করে কাটা ছিল। সেই চৌকোণায় নাদুকে তারা আছাড় মেরে এবং বুট জুতার গোড়ালি দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করল। নাদু মুমূর্ষু অবস্থায় কাতরাতে লাগল। অবস্থা দেখে সবাই চোখের জল ধরে রাখতে পারল না। সবাই ডুকরে কাঁদতে লাগল। এ অবস্থা দেখে আমার দুই দাদু শোকে পাথর হয়ে গেল। আর হাঁটতে পারছিল না। তাদেরকে লাথি মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হলো ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে। এদিকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নাদুকে তারা মেরে ফেলছে, এ দৃশ্য দেখে সবাই মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগল। নাদুর লাশ চরের মধ্যেই পড়ে রইল। নিষ্পাপ বালক নাদুকে প্রাণ দিতে হলো অত্যাচারী পাকবাহিনীর হাতে।

এ দিকে তারা আটককৃত ৩৭ জনের বাঁধন খুলে দিল এবং বলল, তোমরা সবাই লাইন হয়ে দাঁড়াও। সবাই দাঁড়িয়ে সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণ করতে লাগল। তারা ভাবলো, তাদেরকে বাঁচানোর মতো আর কেউ নেই এই পৃথিবীতে। এই বলে তারা অশ্রুসিক্ত নয়নে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকতে লাগল। এমন সময় একজন বাঙালি সৈনিক এসে কানে কানে বললেন, যদি বাঁচতে চাও, নদীতে ঝাঁপ দাও। এদিকে তাদের লাইনের দিকে পাকবাহিনী বন্দুক তাক করে ধরে আছে শুধু হুকুমের অপেক্ষায়। নদীতে ঝাঁপ দেয়ার কথা শুনে অনেকে নদীতে ঝাঁপ দিতে লাগল; পরক্ষণে হুকুম হলো ফায়ারের। সাথে সাথে ফায়ার করা হলো। যারা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা ব্রহ্মপুত্র নদের স্রোতে ভেসে যেতে লাগল। আর যারা ডাঙ্গায় ছিল তারা গুলি খেয়ে মৃত্যুবরণ করল। এদের মধ্যে আমার ছোট দাদুর গুলি লাগেনি। মৃত্যুর ভান করে মাটিতে তিনি শুয়ে ছিলেন। এদিকে পাকবাহিনীর নজর নেই। নজর তাদের নদীর দিকে। নদীর স্রোতের সাথে যারা ডুবছে আর ভাসছে তাদের লক্ষ্য করে আবারও গুলি চালাল। নদীতে যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের কাউকে গুলি লাগাতে পারেনি। তারা ভাসতে ভাসতে নদীর অপর তীরে গিয়ে ওঠে। রৌমারী হয়ে মানকার চরে গিয়ে তারা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়।

এদিকে আমার দাদু সন্ধ্যা সাতটার দিকে নৌকাযোগে রৌমারীতে পৌঁছেন। পরিবারের সকলকে হারিয়ে দাদু পাগলপ্রায় হয়ে যান। ঘুরতে ঘুরতে মানকার চর হয়ে রয়ডোবা নামক শরণার্থী ক্যাম্পে ওঠেন। ওই ক্যাম্পে শুনতে পান তার পরিবারের সদস্যরা আছে বাসন্তির হাটে।

দাদু বাসন্তির হাটে গিয়ে পরিবারের সকল সদস্যের সাথে দেখা করে নাদুর করুণ মৃত্যুর কথা বলতে বলতে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। তারপর দাদুর বড় ভাই তারিণী দাদু এখন শুধুই কাঁদেন। দাদু বলেন ভাই, ভাতিজা ও দেশবাসীকে হারিয়ে আমরা কী পেলাম!

সূত্র: জ-৩৮০৪

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
সৌরভ কুমার ভরদ্বাজ	**চণ্ডিরাম বর্মণ**
বামনাছড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চিলমারী, কুড়িগ্রাম
৮ম শ্রেণি	সম্পর্ক : দাদু
তবকপুর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম	

পতাকার মধ্যে আমাদের দেশের মানচিত্র

চিলমারী উপজেলার রমনা বাজারের নিকট ব্রহ্মপুত্র নদ। প্রতিবারের মতো সেবারেও ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান হবে। আমি ও পরিবারসহ ব্রহ্মপুত্র নদে স্নানের উদ্দেশ্যে রওনা করি। পথিমধ্যে জানতে পারলাম যে অষ্টমীর স্নান তিন জায়গায় হচ্ছে। কারণ জানতে চাইলে তীর্থযাত্রীরা জানান যে নদে সাতটি লাশ ভেসে বেড়াচ্ছে। তাই তিন জায়গায় স্নান হচ্ছে। স্থান রমনা ঘাট, জোড়গাছ ঘাট ও সুতারমারী। আমরা রমনা ঘাটে পৌঁছলাম। লোকজন বলাবলি করছে যে, ওগুলো বিহারিদের লাশ। ওই এলাকার যুবকরা পাকিস্তানি চাকরিজীবীদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করে তাদের হত্যা করে নদে ফেলে দেয়। এই হত্যাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানি মিলিটারি চিলমারী থানায় আক্রমণ করে এবং বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। ওই এলাকায় আমার আত্মীয়-স্বজনরা প্রাণের ভয়ে আমার বাড়িতে এসে আশ্রয় নেয়। ৫-৭ দিন গত হওয়ার পর আমার থানায় পাকিস্তানি মিলিটারিরা অবস্থান নেয়। আমাদের গ্রামে ঘোরাফেরা করে। রাজাকারদের মাধ্যমে আমার বাড়ির দক্ষিণে রামধন গ্রামে নারীদের ক্ষতি করে। এই ভয়ে আমরা হিন্দু সম্প্রদায় মিলে ভোরবেলায় ভারতের উদ্দেশে রওনা করি।

পথিমধ্যে কাঁঠালবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে গুনাইগাছ ইউনিয়নের তৎকালীন চেয়ারম্যান ও তার দলবলসহ আমাদের লোকজনদের স্কুলের বিভিন্ন কক্ষে ঢুকিয়ে দেয়। আর দরজা বন্ধ করে সবার শরীর চেক করে। যার যার কাছে সোনা ছিল ছিনিয়ে নেয়। ভারতে যেতে মানা করে। সবাইকে নিজ নিজ বাড়ি যাওয়ার কথা বলে। আমরা নিজ নিজ বাড়ি ফিরে আসি। সারাদিন অনাহারে থাকার পর ক্লান্ত। তখন সাড়ে চারটা বাজে। বাড়িতে এসে স্নান করে খাওয়ার জন্য রান্নার ব্যবস্থা করি। এমন সময় লোকজন হৈচৈ করে পালিয়ে যায়, বলে মিলিটারি এসেছে। আমরা সপরিবারে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিই এবং সেখানেই রাত্রিযাপন করি। পথিমধ্যে বাকরের হাট নামক স্থানে কিছু লোক আমাদের আক্রমণ করে। সাথে যেসব জিনিস ছিল তা টানাহেঁচড়া করে নিয়ে নেয়। তারপর ১৫-২০ জন লোক এসে আমাদের সহায়তা করে। তারা রাজারহাট পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দেয়। আমরা রাজারহাট বৈদ্যর বাজারের নিকট আশ্রয় নিই। সেখানে রাত্রিযাপন করি। পরদিন সকালে আবার রওনা হই। ফুলবাড়ী উপজেলার নীলেরকুঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিই। রাত্রি যাপনকালে পাকিস্তানি মিলিটারিরা ধরলা নদীতে গোলাগুলি শুরু করে। পাল্টা গুলি করে মুক্তিযোদ্ধারা। গুলির শব্দ শুনে আমরা আতঙ্কিত হই। ছোটাছুটি করে রাত্রে বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিই। ভোরবেলায় আবারও রওনা হই। বেলা ১০টার দিকে কুর্শারহাট নামক বর্ডারে পৌঁছি। বর্ডারের কিছু লোকজন বর্ডার পাশ দেয়। তারপর ভারতের দিনহাটা মহকুমা শহরে উপস্থিত হই। রাত্রিযাপনের জন্য স্থান খোঁজাখুঁজি করি। এবং পুটিমারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিই।

২-৩ দিন ওই স্কুলে রাত্রিযাপন করি। ভারত সরকারের দেয়া রুটি, চাল, ডাল খাদ্য খেয়ে আমরা রাত্রিযাপন করি। ২-৩ দিন পর ওই স্কুলের সামনে লোকসহ একটি ট্রাক এসে আমাদের তাড়াতাড়ি উঠতে বলে। আমরা

তাতে উঠি। ট্রাকটি তিন ঘণ্টা চলার পর মাথাভাঙ্গা থানার নিকট থামে। সেখানে তাঁবুর তৈরি শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিই। সেখানে মহামারি দেখি। ১০-১৫ জন লোক মারা যায়। সেই ভয়ে আমরা সপরিবারে আসামের গোয়ালপাড়া জেলার আগমনি নামক স্থানে আশ্রয় নিই। ওখানে ছয় মাস থাকার পর দিনহাটা মহকুমার নিকটবর্তী বাসন্তি নামক শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিই। দুই মাসের মধ্যে দেশ স্বাধীন হয়। পরিবারের তিন চারজন লোককে হারিয়ে দেশে এসে পৌঁছি। দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের পর দেশে ফিরে দেখি সব কিছু বদলে গেছে। পাকিস্তানি পতাকা আর নেই। নতুন পতাকা। সবুজ পতাকার মধ্যে আমাদের দেশের মানচিত্র।

সূত্র: জ-৩৮১৪

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
কাকলী রানী রায়	**চন্দ্র বর্মণ**
বামনাছড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	গ্রাম : কাঁঠালবাড়ী, থানা : উলিপুর
৭ম শ্রেণি, রোল : ১২	জেলা : কুড়িগ্রাম
উলিপুর, কুড়িগ্রাম	বয়স : ৬০ বছর, সম্পর্ক : ঠাকুরদা

জানাজা ছাড়াই তাকে পুঁতে রাখে

১৯৭১ সালের ২৮ মে। আমার বড় ভাই ধরলা ডিফেন্সে পাকসেনা প্রতিরোধে নিয়োজিত ছিলেন। ভোর ৬টায় কাদামাখা দেহে আমার ভাই সোনাহাটের চর বলদিয়া গ্রামে হাজির হন। তার মুখে শুনতে পেলাম মুক্তিবাহিনী ধরলা ডিফেন্স ছেড়ে দিয়েছে পাকবাহিনীর প্রবল প্রতিরোধের জন্য। আমি শোনামাত্র বাইসাইকেলযোগে ভুরুঙ্গামারী মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চলে আসি। বেলা ১১টা পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের সংবাদ আসতে থাকে। কেউ বলে পাকবাহিনী ধরলা নদী পার হয়েছে, আবার কেউ বলে পার হয়নি। এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে সঠিক সংবাদের জন্য আমরা পুনরায় ধরলা নদীর পাড়ে ডিফেন্স তৈরির জন্য একটা বাস ও একটা ট্রাক ভর্তি করে মুক্তিযোদ্ধা পাঠানোর ব্যবস্থা করি। ১২টার মধ্যেই বাস ও ট্রাকটি ধরলা ডিফেন্সের উদ্দেশে যাত্রা করে। দুর্ভাগ্যবশত ট্রাক-বাস দুটি পুরাতন মালভাঙা ব্রিজের কাছে না যেতেই সেখানে আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা পাকিস্তানি বাহিনী দ্বারা প্রথমে বাসটি পরে ট্রাকটি আক্রান্ত হয়। ট্রাকটি অক্ষত অবস্থায় ভুরুঙ্গামারীতে ফিরে আসে। বাসটিতে আনুমানিক ৩০-৪০ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। আক্রান্ত হওয়ার পর বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। খাদে পানি থাকায় ৪-৫ জন মুক্তিযোদ্ধা ওই স্থানেই শাহাদৎ বরণ করেন। জীবিতদের মধ্যে দুইজন ব্যতীত সবাই পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। পাকবাহিনীর হাতে ধৃত দুইজন আবদুল আজিজ ও আবদুর রহমানের কাঁধে পাকিস্তানি পতাকা দিয়ে দেশি রাজাকারদের নিয়ে পাকবাহিনী মিছিল করতে করতে ভুরুঙ্গামারী টার্মিনালে আনুমানিক চারটার দিকে আসে। স্থানীয় পাকিস্তানি দোসররা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' শ্লোগানের মাধ্যমে পাকবাহিনীকে অভিনন্দন জানায়। পরে মিছিলসহ ভুরুঙ্গামারী পাইলট হাইস্কুলে উপস্থিত হয় এবং ডিফেন্স গড়ে তোলে। ধৃত আবদুল আজিজ ও আব্দুর রহমানকে হাত-পা বেঁধে বন্দি করে রাখে স্কুলের পূর্ব পাশের একটি কামরায়। আব্দুর রহমান সুকৌশলে হাত-পায়ের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে আবদুল আজিজকে মুক্ত করতে চায়। কিন্তু সে ভয়ে অস্বীকৃতি জানায়। পরে আব্দুর রহমান অতি সতর্কতার সাথে রমজান মৌলবির বাঁশবাগানে ঢুকে পালিয়ে আসে। ওই দিনই বিকেল চারটায় বন্দি দুজনকে খুঁজে তারা। একজনকে না পেয়ে আব্দুল আজিজকে পরদিন সকালে চোখ বাঁধা অবস্থায় চিত্ত মাস্টারের বাড়ির উত্তর পাশে পুরাতন সংকোশ নদীতে ঠেলে ফেলে দেয় এবং ২-৩ রাউন্ড গুলি করে। পরে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করে চলে আসে। পরে স্থানীয় কিছু লোক জানাজা ছাড়াই তাকে পুঁতে রাখে। শহিদ আজিজের চাপা দেয়া কবরটি আজ আর কেউ স্মরণ করে না। শহীদের বাবা-মা বেঁচে থাকতে সরকারিভাবে অনুদান পাননি।

সূত্র: জ-৯৭০

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. নাসির আহম্মেদ (সানি)	**আব্দুল হাকিম মাস্টার**
ভুরুঙ্গামারী পাইলট হাই স্কুল	গ্রাম : দেওয়ানের খামার, ভুরুঙ্গামারী
সপ্তম শ্রেণি, রোল : ১৭, ক শাখা	কুড়িগ্রাম

আকাশ রক্তবর্ণ হয়ে গিয়েছিল

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের কিছু কথা আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার কাছে শুনেছি। তার নাম মসলিম উদ্দিন। তিনি সাক্ষাৎকারে বলেন, আমি ভারতের সাহেবগঞ্জ ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যোগ দেই। সেখানে ২১ দিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। তারপর আমাদেরকে ভারতের কুচবিহার টাপুরহাট সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। ছয় দিন পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় মুজিব ক্যাম্প জলপাইগুড়ি। সেখানে আমরা ২৯ দিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। তারপর সেখান থেকে আমাদের ৬ নম্বর সেক্টর গিতালদহে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আমাদের প্লাটুনে ১০০ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন খোকন মিয়া এবং ক্যাপ্টেন ছিলেন আবুল বাশার।

একদিন আমরা সেখান থেকে মোগলহাটে রওনা হলাম। সেখানে আমরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে মোকাবেলা করি। উভয়পক্ষের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেই যুদ্ধে আমাদের ১৩ জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ও চারজন আহত হন। শহিদদের দুইজন হলেন আবদুল মান্নান ও ছাত্তার আলী। সেদিন সারা রাত প্রচণ্ড গোলাগুলি চলে। আকাশ রক্ত বর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের থাকার জায়গা ছিল মাটির নিচের বাংকারে। তার পাশেই পাকিস্তানি সৈন্যরা বোমা বিস্ফোরণ করছিল। সেখানে কয়েকটা বাড়িঘর পুড়ে ছারখার হলো। আমাদের অনেকেই নিহত ও আহত হলো।

আমাদের প্লাটুনের কমান্ডার একদিন আমাকে নির্দেশ দিলেন ছদ্মবেশে পাকিস্তানিদের গোপন তথ্য নেওয়ার জন্য। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। আরেকজন জোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলাম। তখন আমার কাছে ছিল একটি স্টেনগান এবং গায়ে ছিল একটি চাদর। ধরলা নদী পার হয়ে কাশবনে ঢুকি। কাশবন পেরিয়ে কিছু দূরে পাড়াগাঁয়ে ঢুকলাম। এক বাঙালির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তাকে ফুসলিয়ে হানাদার বাহিনীর আস্তানা জেনে নিই। আস্তে আস্তে তাদের ক্যাম্পের কাছে এসে সব ঠিকঠাক মতো জেনে নিই। তারপর আমি ফিরে যাই আমার ক্যাম্পে। ক্যাম্পে গিয়ে সব গোপন তথ্য ক্যাপ্টেন সাহেবকে জানাই। ক্যাপ্টেন সাহেব সঙ্গে সঙ্গে ম্যাপ করে নেন। সে রাতেই আমাদের ৫২ জন মুক্তিযোদ্ধাদের অ্যাম্বুশে পাঠান। আমরা গিয়ে অ্যাম্বুশের ফাঁদ পাতি এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের অ্যাম্বুশের ফাঁদে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়। আমাদের অনেকেই নিহত হয় এবং কয়েকজন আহত হয়। তখন আমরা মরণকে সামনে রেখে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু করে দিই এবং পাকিস্তানিরা পিছু হটতে শুরু করে। সেই সাথে তিনজনকে ঘেরাও করে ফেলি। তারপর তারা আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এভাবে অনেক রক্তের বিনিময়ে নয় মাস যুদ্ধ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছি।

সূত্র: জ-৯৭৬

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
জহুরুল ইসলাম	**মো. মুসলিম উদ্দিন (মুক্তিযোদ্ধা)**
ভুরুঙ্গামারী পাইলট হাই স্কুল	গ্রাম : খামার পত্রনবিস, থানা : ভুরুঙ্গামারী
গ্রাম : পাইরোড ছড়া, থানা : ভুরুঙ্গামারী	জেলা : কুড়িগ্রাম
জেলা : কুড়িগ্রাম	

তুমি নাকি শেখ মুজিবের লোক

২৬ মার্চ (রংপুর) রাত ১০টায় আমার এক পাঠান বন্ধু বাড়িতে এসে বলল, ভাই তুমি এখনই পালাও, আর্মি আসছে তোমাকে ধরার জন্য, তুমি নাকি শেখ মুজিবের লোক। সে আমার হাতে তিন হাজার টাকা দিল। আমার গ্রামটা ছিল বিহারি পাড়া। আমি বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে রাতের অন্ধকারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ৫-৬ বাড়ি পর এক বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। সারারাত জেগে ভোরে আজানের সময় রিকশা নিয়ে আমাদের গ্রামের বাড়ি মীরবাগের উদ্দেশে রওনা দিলাম। সেখানে ৮-১০ দিন থাকার পর সিতাই বর্ডার দিয়ে পার হয়ে ভারতের সিতাই বন্দরে এলাম। হোটেলে খেতে বসেছি, এমন সময় আমার এক বন্ধু বিজন এসে আমাকে বলল, তুই মন্টু না! যখন আমাদের পরিচয় হলো, সে আমার হোটেলের বিল দিয়ে দিল এবং আমাকে দিনহাটা সাহেবগঞ্জে পৌঁছে দিল। গাড়িভাড়া তো নিলই না, উপরন্তু সে আমাকে দুই হাজার টাকা দিল এবং ঠিকানা দিয়ে বলল, দরকার পড়লে যোগাযোগ করতে।

সাহেবগঞ্জে প্রায় ৮-১০ দিন থাকার পর। হঠাৎ সুবেদার বোরহান সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো। তার সঙ্গে রংপুরে আমার আগের পরিচয় ছিল। উনি আমাকে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য ডাক দিলেন। আমি রাজি হয়ে তার কোম্পানিতে যোগ দিলাম। আমি আর্মির লোক বলে আমার ট্রেনিংয়ের দরকার হলো না। হঠাৎ আমাদের কোম্পানিতে হুকুম এলো পাটগ্রাম যেতে হবে। সকাল ১১টার সময় কয়েকটি ট্রাক এলো। আমরা সবাই ট্রাকে উঠে বসলাম। ট্রাকগুলো আমাদের পাটগ্রামে নিয়ে গেল। তখন সকাল হয়ে গেছে। সেখানে প্রায় ৫-৬ ঘণ্টা থাকার পর রওনা হলাম। দুপুরে বাউড়া রেলস্টেশনে এলাম। সেখানে এক বাড়িতে আমাদের খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের কোম্পানি মার্চ করল বিকাল ৫টায়। আমরা এক গ্রামের একটা বড় বাড়িতে উঠলাম। সেটা ছিল ডা. কামাল-এর বাড়ি। ওখানে রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্রিযাপন করা হলো। আবার আমরা ভোরে রওনা দিলাম। আমরা বিকালে দোআনির চরে পৌঁছলাম। সেখানে এক মেম্বারের বাড়িতে অবস্থান নিলাম। দুই দিন থাকার পর তিস্তা ব্যারেজের পাশে আমরা ডিফেন্স নিলাম। সেখান থেকে পাকিস্তান আর্মির পজিশন মাত্র দুই মাইল দূরে। ডিফেন্স নেয়ার পর দুইদিন আমরা কিছুই খাইনি। বোরহান সাহেব গ্রামের কিছু লোকের সহায়তায় দুই বস্তা চিড়া জোগাড় করলেন। ওই চিড়া খেয়ে আরও একদিন থাকলাম। রাতে পাকসেনাদের সঙ্গে গোলাগুলি হয়, দিনে আমরা ঘুমাই। পরে গ্রামের লোকদের সহায়তায় চাল-ডাল জোগাড় করে খাবার ব্যবস্থা করা হলো। এভাবে আমরা দুই দিন ওখানে থাকলাম। আমাদের গোয়েন্দারা এসে জানাল পাকসেনারা পিছু হটে গেছে বড়খাতা রেলস্টেশনের কাছে। বোরহান সাহেব আমাদের নিয়ে খেরু চেয়ারম্যানের বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। তখন রাত প্রায় ১০টা।

বোরহান সাহেবের কাছে খবর ছিল কিছু পাকসেনা খেরু চেয়ারম্যানের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করছে। আমরা খেরু চেয়ারম্যানের বাড়ির কাছে অবস্থান নিলাম। বোরহান সাহেব আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, মন্টু মিঞা, খেরুর বাড়ি আক্রমণ করতে হবে, সেখান থেকে কোনো লোক যেন পালিয়ে না যেতে পারে। জীবিত ধরবেন নতুবা মেরে ফেলবেন। আর আমার একটা জোয়ানেরও যেন ক্ষতি না হয়। আমি তাকে সালাম করে নয় জন জওয়ানকে নিয়ে খেরু চেয়ারম্যানের বাড়ি আক্রমণ করলাম দুই দিক থেকে। আল্লাহর রহমতে আমার একটা জওয়ানেরও ক্ষতি হয়নি। যখন আক্রমণ করি তখন পাঁচ জন পাকসেনা ও তিন জন রাজাকার ছিল; আমরা একসঙ্গে ছয়টা গ্রেনেড থ্রো করি। ওই আটজন লোকের ছয় জন মারা যায় আর দুই জন আহত রাজাকারকে ধরে এনে বোরহান সাহেবের হাতে দিই।

ওখানে চার দিন থাকার পর হঠাৎ খবর এলো সিংগীমারী বিওপিতে সুবেদার ফজলু সাহেবের কোম্পানির সব লোককে মেরে ফেলছে পাকসেনারা। বোরহান সাহেব আমাকে ডেকে বললেন, মন্টু মিঞা, আপনি একজন আর্মির লোক, আজ রাত্রেই লোক নিয়ে সিংগীমারীতে ডিফেন্স নিতে হবে। তা না হলে আমরা সবাই মারা যাব। আমি তখন আমার কোম্পানি থেকে সাহসী বারো জন লোককে নিয়ে প্রায় দেড় মাইল রাস্তা ক্রলিং করে সিংগীমারীতে পৌঁছলাম রাত্র দুইটায়। ওখানে আমার জওয়ানদের পুরানো গর্ত ভাগ ভাগ করে অবস্থান নিতে বললাম। আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে চারটা করে গ্রেনেড, একটা এলএমজি আর এসএলআর ছিল। জ্যোৎস্নায় সব দেখা যাচ্ছে। প্রায় ৬০-৭০ জন পাকসেনা সিংগীমারী ক্যাম্পের দিকে আসছে। তারা জানত ওই ক্যাম্পে কোনো লোক

নেই। আমি এলএমজি নিয়ে বসলাম, বাকি সবাইকে এক জায়গায় রাখলাম। পাকসেনারা যখন ৫০ গজের মধ্যে এলো তখন আমি ফায়ারের হুকুম দিলাম, আমি ৫ ম্যাগজিন খালি করে ফেললাম। এমন সময় দেখি বোরহান সাহেব গ্রামের প্রায় ১০০ লোক ও আমাদের সব জওয়ানদের নিয়ে দৌড়ে আসছেন। উনি এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সে কী আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তারপর ওখানে গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় আটটা ট্রেঞ্চ তৈরি করে আমরা অবস্থান নিলাম। দিন খুব ভালোভাবে গেল। তারপর হঠাৎ পাকসেনারা লাগাতার তিন ঘণ্টা রকেট লাঞ্চার ফায়ার করল। আমরা কোনো গোলাগুলি করিনি। যদি আমরা ওই দিন সিংগীমারীতে ডিফেন্স না নিতাম তবে ওই ফাঁক দিয়ে পাকসেনা ঢুকে দুই পাশের তিন কোম্পানির সব লোককে মেরে ফেলত।

কয়েক দিন পর আমাদের গোয়েন্দা এসে জানাল যে, আমাদের একজন গোয়েন্দাকে পাকসেনারা ধরে নিয়ে গেছে। পাকসেনাদের ক্যাম্প ছিল বড়খাতা রেলস্টেশনের পূর্ব পাশে। বোরহান সাহেব আমাকে ডাক দিলেন ওনার ট্রেঞ্চে। উনি আমাকে বললেন, আমাদের গোয়েন্দা রাজাকারদের হাতে ধরা পড়েছে, তাদের বাঁচানোর উপায় দেখুন। পরে ওনার পরামর্শ মতো আমি তিন জন সাহসী যোদ্ধাকে নিয়ে রাত্র নয়টার সময় রওনা দিলাম রাজাকারদের এরিয়ার ভেতর। আমাদের গোয়েন্দা সব আমাদের ম্যাপ করে দিয়েছে কোন দিক দিয়ে গেলে পাকসেনার দেখা পাওয়া যাবে না। আমাদের সঙ্গে চারটা করে গ্রেনেড, দুইটা এসএমজি, দুইটা এসএলআর যথেষ্ট গুলি ছিল। আমরা রাত এগারটার কিছু আগে জায়গা মতো পৌঁছলাম এবং এক বাঁশ বনের ভেতর আশ্রয় নিলাম। ওই বাঁশ বন থেকে প্রায় ১০০-১৫০ গজ ভেতরে একটা হ্যাজাক লাইট জ্বলছিল। ছয়-সাত জন রাজাকার ওই গোয়েন্দাকে পানিতে ডোবাচ্ছে। সেই লোকের কী মর্মান্তিক চিৎকার! আমরা চারজনে বুদ্ধি করে দুই দিক দিয়ে অগ্রসর হলাম। আমরা দুই জন প্রায় ২৫-৩০ গজের মধ্যে পৌঁছে গেলাম। একটা বড় আমগাছের আবডালে পজিশন নিয়ে পর পর চারটা গ্রেনেড থ্রো করলাম। অপর দুই জন এসে ওকে বেয়নেট চার্জ করে মেরে ফেলল। ওখান থেকে আমরা চারজন দৌড়ে বহু কষ্টে আমাদের ক্যাম্পে এসে পৌঁছলাম। বোরহান সাহেবকে বিস্তারিত বললাম। উনি মহাখুশি হলেন।

তারপর আমরা ১০-১২ দিন সিংগীমারী বিওপিতে অবস্থান করার পর হঠাৎ সংবাদ এলো পাকহানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। তখন আমাদের উল্লাস দেখে কে! ওই রকম আনন্দ উল্লাস জীবনে কোনোদিন কেউ করেনি। বোরহান সাহেব সবাইকে আত্মসংযমী হতে বললেন। উনি চার জন গোয়েন্দাকে বড়খাতা পাঠালেন পরিস্থিতি দেখার জন্য। দুই ঘণ্টা পর গোয়েন্দারা ফিরে এসে বললেন, এরিয়া মুক্ত। তখন সবাইকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড় করালেন এবং কিছু মূল্যবান বক্তব্য দিলেন। তারপর আমরা বড়খাতার দিকে রওনা হলাম। বড়খাতায় এক ঘণ্টা অবস্থান করার পর আমরা লালমনিরহাট জংশনের দিকে রওনা হলাম। তার আগে দুই জন দুই জন করে ভাগ করে ছয় জন গোয়েন্দাকে রেললাইন দিয়ে আগে রেকি করার জন্য পাঠালেন। আল্ল-াহর নামে ভরসা করে আমরা লালমনিরহাটের দিকে রওনা হলাম। তখন আমরা মোট যোদ্ধা ১০৩ জন। রেললাইন দিয়ে হেঁটে আমরা ভোর চারটার সময় লালমনিরহাট ডাকবাংলোয় পৌঁছলাম। সেখানে বহু গ্রামবাসী এবং স্বাধীনতাপ্রিয় লোক আমাদের সংবর্ধনা দিতে এলো। কারও হাতে ফুলের তোড়া, কারও হাতে মিষ্টি; সে কী আনন্দ উৎসব ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। এমন মিলনমেলা কেউ কখনও দেখেনি। সকালের চা-নাস্তা খাওয়ার পর বোরহান মাঠে সবাইকে একত্রিত করে এরিয়া ভাগ করে দিলেন। আমার ভাগে পড়ল রেলওয়ে জংশন ও রেলওয়ে হাসপাতাল। ২০ জন যোদ্ধা আমার সঙ্গে ছিল। আমি সবাইকে তিন ভাগে ভাগ করে এক ভাগ হাসপাতালে, এক ভাগ জংশনে আর একভাগ নিজে রাখলাম মোবাইলে। সেখানে কিছুদিন থাকার পর আমাদের কোম্পানি নিয়ে রংপুর ক্যান্টনমেন্টে রওনা দিলাম। সেখানে দুই দিন থাকার পর অস্ত্র জমা দেওয়া হলো এবং সার্টিফিকেট নিয়ে বাড়ি এলাম।

তখন আমার বাড়ি ছিল রংপুর শালবনে। বাড়িতে গিয়ে দেখি বাড়ি নেই, ওখানে একটা ইট পর্যন্ত নেই। বিহারিরা আমার সব জিনিস লুটপাট করে নিয়ে গেছে।

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. রওশন মাসুদ (রুমান)	**মো. মমিনুল হক (মন্টু মিয়া)**
গ্রাম : দেওয়ানের খামার	গ্রাম : দেওয়ানের খামার
পোস্ট ও থানা : ভুরুঙ্গামারী, জেলা : কুড়িগ্রাম	ভুরুঙ্গামারী, জেলা : কুড়িগ্রাম

শহিদ রহিমের আংটি খুলে কমান্ডারের হাতে দেয়া হয়

গল্প করতে করতে এক সময় তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৯৭১ সালের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা আমার কাছে বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর আমি দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য সবার অজান্তে মুক্তিযোদ্ধার খাতায় নাম লেখাই এবং রৌমারী হাই স্কুল মাঠে প্রতিষ্ঠিত ক্যাম্পে যোগদান করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি।

কোম্পানি কমান্ডার মোহাম্মদ আবুল কাশেম চাঁদ-এর নির্দেশে চিলমারী জোড়গাছ প্রাইমারি স্কুলে রাজাকার ক্যাম্পে হানা দিয়ে ৮০ জন রাজাকারকে গ্রেপ্তার করি। পরদিন আবার রৌমারী চলে যাই এবং চিলমারী থানার ফকিরেরহাট ক্যাম্পে কোম্পানি কমান্ডারকে হ্যান্ডওভার করি। কিছু দিন পর হাতিয়ায় কাউন্টার অ্যাটাক করি এবং আমার এলএমজি ব্রাশে তিনজন পাকসেনা নিহত হয়। ওদের গুলিতে প্রায় ৫০০ জন পাবলিক মারা যায়। আমার হাঁটুর ওপরে ও নিচে মর্টারের টুকরো লাগে এবং একই সঙ্গে আমার সাথি জাহাঙ্গীরের কোমরের পেছনে মর্টারের টুকরো লেগে সেও আহত হয়। এরপর ছোটখাটো অনেক অপারেশন করা হয়।

এর মধ্যে চিলমারী থানার বালাবাড়ীর হাটে আনুমানিক দুপুর একটা হতে দেড়টার সময় আমাদেরকে খানসেনারা ঘেরাও করে ফেলে। আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা গুলি বিনিময়ের পর ওদের রাজাকার কমান্ডার অমর উদ্দিনের গুলি লাগে। তাকে রানীগঞ্জ বাজারের পাশে নিয়ে আসি। তারপর শেষ অপারেশন চালানো হয় নয় ডিসেম্বর উলিপুর ডাকবাংলোয় খানসেনাদের ঘাঁটিতে। রাত ১১টা হতে সকাল সাতটা পর্যন্ত তুমুল লড়াই চলে। ভোর ছয়টার সময় আমার সহযোদ্ধা আব্দুর রহিম আমার বাম পাশে আনুমানিক পাঁচ গজ দূরত্বে পজিশনে ছিল। এমতাবস্থায় হঠাৎ খানসেনার একটি বুলেট আব্দুর রহিমের মাথার বাম পাশে বিদ্ধ হয়ে ডান দিকে বের হয়ে যায়।

তখন সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আব্দুর রহিমের মৃত্যুর সংবাদ শোনার পর কোম্পানি কমান্ডার সাইকেলযোগে উলিপুর রওনা হন। শহিদ রহিমের আঙুলের স্বর্ণের আংটি খুলে কোম্পানি কমান্ডারের হাতে দেয়া হয়। এরপর অনেক কষ্টে আব্দুর রহিমের লাশ ধামশ্রেণী ইউনিয়নে দাফন করা হয়। ১১নং সেক্টরের কোম্পানি কমান্ডার আবুল কাশেম চাঁদ, কমান্ডার মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ ও মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এবং অবসরপ্রাপ্ত প্লাটুন কমান্ডার সোলেমান আলী এ সেক্টরে নিয়োজিত ছিলেন। এই আমার মুক্তিযুদ্ধ জীবনকালের ঐতিহাসিক ও মর্মান্তিক প্রতিবেদন।

সূত্র: জ-১২৪৩

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. মাহমুদুল হাসান মিলন	**মো. রফিকুল ইসলাম সরদার**
চিলমারী ডিগ্রি কলেজ	গ্রাম : বিষ্ণুবল্লভ, পোস্ট : ধামশ্রেণী
স্নাতক, রোল : ৭৪	উলিপুর, কুড়িগ্রাম

চিলমারী থানা গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল

চিলমারী থানা অবস্থিত ছিল কুড়িগ্রাম জেলার অধীনে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম পাড়ে। মুক্তিবাহিনী কর্তৃক চিলমারী থানা সফল অপারেশন ছিল এতদাঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি সফল অপারেশন। দিনের বেলা ক্ষিপ্রগতিতে শত্রুপক্ষ কোনো কিছু বোঝার আগেই তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া, রণকৌশলগত দিক দিয়ে ছিল তাৎপর্যপূর্ণ একটি কৌশল।

১৫ জুলাই ছোট্ট একটা নৌকা জোগাড় করে আমরা এগারো জন রৌমারী পৌঁছলাম। নৌকাটা এতো ছোট ছিল যে, আমাদেরকে শুতে হতো হাত-পা গুটিয়ে। তিন-চারদিন এভাবে নৌকায় ঘুমানোর জন্য পায়ে অসহ্য ব্যথা হয়। নৌকায় করে আমরা রৌমারী থেকে চিলমারী বন্দরের বিপরীত দিকে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব পাড়ে অবস্থিত সামাদ মেম্বারের চরে চলে এলাম। প্রায় দুদিন আমাদের কোনো খাওয়া-দাওয়া নেই। নদীর পশ্চিম পাড়ে চিলমারী থানা। সেখানে পাকবাহিনীর অবস্থান। আমরা সে অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালাব। আপাতত এটাই আমাদের লক্ষ্য। এর মধ্যে আমরা সামাদ মেম্বারের চরের সামাদ মেম্বারের দেখা পেলাম। তাকে বললাম, আমরা মুক্তিযোদ্ধা, ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছি। চিলমারী থানা দখল করতে চাই।

সামাদ মেম্বার একদল অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত মুক্তিযোদ্ধা দেখে বিস্মিত হলেন। আমরা তাকে আমাদের দুদিন অভুক্ত থাকার কথা বলে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করার অনুরোধ করলাম। তিনি আয়োজন করলেন। আমরা অনেক তৃপ্তিসহকারে খেলাম। খাবার সময় সামাদ মেম্বার ওপারে পাকবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে আমাদেরকে অনেক খোঁজখবর দিলেন। অল্প লোকবল ও অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করতে বারণও করলেন। তার আশঙ্কা পাকবাহিনীর সঙ্গে অসমযুদ্ধে আমাদের প্রাণহানি ঘটবে।

তার সাবধানবাণী আমরা আমলে নিলাম এবং অপারেশন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করলাম। আক্রমণ রচনা বিষয়ে ভাবনাচিন্তার ভেতরই দিন দুয়েক পর সামাদ মেম্বার আমাদের খবর দিলেন যে, পাকবাহিনী চিলমারী ছেড়ে চলে গেছে। খবর পেয়ে এবার আমি থানা দখলের সিদ্ধান্ত নিলাম। সামাদ মেম্বারকে বললাম, চিলমারী থানার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর আমাকে সংগ্রহ করে দিন।

সামাদ মেম্বার খোঁজখবর জানার জন্য পশ্চিম পাড়ে দুজনকে পাঠালেন। তারা ফিরে এসে জানাল, থানা প্রাঙ্গণে পাকা বাংকার তৈরি হয়েছে। সারারাত জেগে পুলিশ সেই সুরক্ষিত বাংকারে অবস্থান নিয়ে থানা পাহারা দেয়। সামাদ মেম্বার রাতে থানা আক্রমণ না করার পক্ষে তার মতামত জানালেন। কারণ, রাতে পুলিশরা সতর্ক থাকে। ফলে, দিনের বেলা থানা আক্রমণের চিন্তা করলাম। দিনে থানার পাহারা ঢিলেঢালা থাকে ও পুলিশরা বাজারে ঘোরাঘুরি করে।

১৯ জুলাই আমরা চিলমারী থানা আক্রমণের পরিকল্পনা করলাম। ওই দিন দুপুরের খাওয়া একটু আগেভাগে সেরে দুপুর ১২টার দিকে আমরা বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ নৌকায় পাড়ি দিলাম। চিলমারী বন্দর থেকে ভাটির দিকে থানার প্রায় দেড় মাইল দূরে জোড়গাছ বাজারে আমরা সকলেই বিকেল তিনটার দিকে হাজির হলাম। পূর্বেই নির্দেশ দেয়া ছিল যে, খুব দ্রুত ঝড়ের গতিতে থানা আক্রমণ করতে হবে। আমরা দ্রুত গতিতে চিলমারী থানার ২৫ গজের মধ্যে জমির আইলে অবস্থান নিলাম। পাক পুলিশ কিছু বুঝে ওঠার আগেই থানার ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করলাম। এভাবে দিনের বেলা মুক্তিযোদ্ধারা অত দ্রুত গতিতে থানা আক্রমণ করবে এটা ছিল পাক পুলিশের কাছে অকল্পনীয়। চিলমারী থানা কার্যালয়ের চাল ও বেড়া ছিল ঢেউটিনের। বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণের ফলে থানাগৃহ ঝাঁঝরা হয়ে জালের মতো হয়ে গেল। এই অতর্কিত হামলার ফলে পাক পুলিশরা যে যেদিকে পারল পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল এবং সামান্যতম প্রতিরোধ গড়ার সাহস ও সুযোগ পেল না। আমরা থানা দখল করলাম এবং থানার কোত ভেঙে ১২টা রাইফেল, শ'দুয়েক রাউন্ড গুলি, ৪-৫টা হেলমেট ও কিছু বেয়নেট আর অন্যান্য সরঞ্জাম পেলাম এবং সেগুলো নিয়ে আমাদের ঘাঁটিতে ফিরে এলাম।

সূত্র: জ-৯৯৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
জীবননেছা খাতুন	**মো. আবদুল কাদের (মুক্তিযোদ্ধা)**
গোলাম হাবিব মহিলা ডিগ্রি কলেজ	গ্রাম ও পোস্ট : রমনা, থানা : চিলমারী
একাদশ শ্রেণি	জেলা : কুড়িগ্রাম
	সম্পর্ক : চাচা, বয়স : ৫৩

যুদ্ধে তাদের হৃদয় কি পাথরের মতো হয়ে গিয়েছিল?

আমার নানির নাম আছিয়া বেগম। তিনি মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন। বাড়ি ছিল কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী থানায়। নানি মাঝে মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলতেন। আমরা শুনতাম কিন্তু ভাবতাম না। ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেখে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ হৃদয়ে নতুন করে দোলা দিতে লাগল। জানতে বড় ইচ্ছা করল আজ আমরা যে স্বাধীন দেশে বাস করছি তা কীভাবে সম্ভব হয়েছিল। তাই নিজে থেকে নানিকে বললাম, নানি মুক্তিযুদ্ধের সময় ঘটে যাওয়া তোমার জীবনের কিছু কথা বল। তখন নানি যা বলেছিল তাই নিজের ভাষায় লিখলাম।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মানুষের এত বেশি কষ্ট হয়েছিল যে শুনতে অবাক লাগে। সেই সময়ে আমার নানি ছিলেন সাত সন্তানের মা। নানা ছিলেন রেলের একজন কর্মকর্তা। তাদের দিন ভালোই কাটছিল। হঠাৎ শুরু হলো যুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে একটি দিনের জন্যও তারা শান্তিতে থাকতে পারেননি। কারণ, তাদের বাড়ির সামনেই ছিল পাকহানাদার বাহিনীর ক্যাম্প। তারা কখনো বাড়ি থেকে চলে গেছেন আবার ফিরে এসেছেন। কারণ কোথায় থাকবেন তারা নিজেদের বাড়ি ছাড়া।

যুদ্ধের সময় মহিলারা তাদের ছোট ছেলেমেয়েদের বাড়ির সামনে গেটে বসিয়ে রাখত। আর নিজেরা সংসারের কাজ করত। যখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দেখত পাকবাহিনী তাদের হামলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। তখনই তারা ছুটে বাড়িতে আসত আর সবাই মিলে জীবন বাঁচাতে পালিয়ে যেত কোনো এক নিরাপদ আশ্রয়ে। তারা সবাই থাকত এক সাথে। কিন্তু যারা পালাতে পারেনি তাদের ওপর চালিয়েছে অমানবিক অত্যাচার। মহিলাদের করেছে ধর্ষণ।

হঠাৎ একদিন তাদের পরিবারে নেমে এলো চরম বিপর্যয়। তখন যুদ্ধ শেষের দিকে। আমার নানির এক ভাই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তিনি একটি লোকের মাধ্যমে সংবাদ পাঠালেন তার বোন জামাইয়ের কাছে। কিন্তু যথাসময়ে লোকটি সংবাদ পৌঁছাতে পারেনি। তাই তো তার এই সর্বনাশ। সংবাদটা ছিল এ রকম যে, আমার নানা-নানিরা যেন তাদের বাড়ি থেকে সাত-আট মাইল দূরে চলে যায়। যেদিন খবর পেল সেদিন আমার নানা বাসায় ছিলেন না। তাই নানি তাকে ছেড়ে যেতে চাইলেন না। সারাদিনের ব্যস্ততা শেষে বাসায় ফিরলেন নানা, সব কিছু শুনলেন। তারপর বললেন, আজ এই সন্ধ্যায় কোথায় যাব? কাল যাব। কিন্তু তার আর এই বাড়ি ছেড়ে যাওয়া হলো না। রাত ভালোই কাটল। পরের দিন নানা ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়ে কোরআন পড়ছিলেন। এমন সময় তার সামনে একটি গুলি এসে পড়ল। তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাড়ির পেছনে অনেকগুলো গাছ ছিল সেখানেই সবাই সারি বেঁধে শুয়ে পড়লেন। এরপর যা ঘটেছিল শুনে আমার চোখে জল চলে এলো। দেশের জন্য মানুষকে কতই না ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল।

শুরু হলো গুলির পর গুলি, বোমার পর বোমা। গুলিগুলো হয়তো চাল ভেদ করে ঘরের মধ্যে পড়েছিল; কিন্তু বোমা মিশে গেল আমার নানার শরীরে। মাঝে আমার ছোট খালা ছিলেন তার বুকের ঠিক মাঝখানটাতে বোমা পড়েছিল। বয়স ৯-১০ মাস। সে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। নানির ডান হাত নষ্ট হলো আর সাথে রেখে গেল সব ভাই বোনদের মধ্যে ক্ষতের চিহ্ন। কারও পায়ে, কারও গায়ে ও মাথায়। আজও আছে সবার শরীরে কাটা দাগ। সেদিন নানির এক আত্মীয় সাথে ছিল। সেও বাঁচতে পারেনি। নানি সে সময় অসুস্থ ও অজ্ঞান ছিলেন। নানির ছোট ছেলে হায়দার মৃত বাবা ও বোনকে ফেলে আহত মাকে নিয়ে আশ্রয়ের জন্য যাত্রা শুরু করল। সেদিন যাত্রা পথে নানির যে কষ্ট হয়েছিল তা শুধু তিনি জানেন। অন্য ভাই-বোনেরা ক্ষত-বিক্ষত শরীর নিয়ে বাবা ও বোনকে রেখে গিয়েছিল অন্য কোথাও। তাদের দেখে অন্য সব মানুষ শুধু হায় হায় করছিল আর নিজেদের জান নিয়ে পালানোর চেষ্টা করছিল। নানিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো এবং তার ডান হাতটি কেটে ফেলা হলো।

সাত দিন পর আমার ছোট মামা বাড়িতে এলো। ঘরে কিছু চাল ছিল, তাই সঙ্গে নিল। নানি তাকে বলেছিল, তোর বাবার কোমরে টাকা আছে। মৃত বাবার কোমর থেকে লুঙ্গির মধ্যে লুকিয়ে রাখা টাকাগুলো নির্ভয়ে হাতে তুলে নিয়েছিল। ভাবতে অবাক লাগে, যুদ্ধে তাদের হৃদয় কি পাথরের মতো শক্ত হয়ে গিয়েছিল? যুদ্ধ কি মানুষের

মন থেকে ভয় কেড়ে নিয়েছিল। মামা কিন্তু বাবা ও বোনকে কবর দিতে পারেননি। কারণ, তিনি এত ছোট ছিলেন যে, তার একার পক্ষে তাদের কবর দেওয়া সম্ভব ছিল না। নানির বড় ছেলে ছিল। সে গিয়েছিল যুদ্ধ করতে। সে জানে না তার অনুপস্থিতিতে তার জীবনের কত বড় সম্পদ সে হারিয়েছে। এতো কিছু ধ্বংস করার পরেও কুত্তাগুলো শান্ত হয়নি। তারা আমার নানির বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল। সেদিন আমার নানা ও খালা কুকুর শিয়ালের খাবারে পরিণত হয়েছিল।

বড় ছেলে যুদ্ধ শেষে বাড়িতে ফিরে এসে পোড়া বাড়ি আর কিছু হাড়-হাড্ডি ছাড়া কিছুই পেল না। সব কিছুর বিনিময়ে পেল স্বাধীনতা। আমার নানি আজও বেঁচে আছে; কিন্তু আর দশটা মানুষের মতো স্বাভাবিক জীবন নিয়ে নয়। এরপর নানি যা বলেছিল তা লিখতে ইচ্ছা করছিল না তবু লিখলাম। নানি বলেছিল, 'বেশি কিছু না দিতে পারলেও একজন মুক্তিযোদ্ধার মা হিসেবে কিছুটা সম্মান দিতে তো পরতো, কিন্তু তাও তো হলো না!'

সূত্র: জ-১০০২

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
আয়শা বেগম	**আছিয়া বেগম**
গোলাম হাবিব মহিলা ডিগ্রি কলেজ	গ্রাম : সবুজপাড়া, ডাক ও থানা : চিলমারী
একাদশ শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ	জেলা : কুড়িগ্রাম
	সম্পর্ক : নানি, বয়স : ৬০

ফুলবাড়ীকে মুক্ত অঞ্চল ঘোষণা করলেন

কুড়িগ্রাম পাকিস্তানি বাহিনী দখল করল। প্রতিরোধ যুদ্ধে আমরা পিছু হটে ফুলবাড়ীতে সমবেত হলাম। ধরলা নদী ফুলবাড়ীকে অর্ধচন্দ্রাকারে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক বেষ্টন করে আছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম শহর দখল করে বাড়িঘর ও স্থাপনা আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। ধরলা নদীর ওপার থেকে আশ্রয়হারা মানুষ দলে দলে ফুলবাড়ী আসছে আশ্রয়ের আশায়। ওপারের বাড়িঘর পুড়ে যাওয়া ছাই ও ধোঁয়া ফুলবাড়ীর আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলছে। আশ্রয়হারা মানুষের আহাজারি ও শিশুর ক্রন্দনে ফুলবাড়ীর মানুষও আতঙ্কগ্রস্ত।

বাঙালি সৈনিক, সীমান্তরক্ষী সৈনিক, পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর বাঙালিদেরকে নিরস্ত্র করে হত্যা করেছে পাকিস্তানি হায়েনা মিলিটারি। বাঙালি সৈনিকরা মুক্তিফৌজ নামে ফুলবাড়ীতে সমবেত হচ্ছেন। কুড়িগ্রাম জেলার প্রায় সকল রাজনৈতিক মনীষী আজ ফুলবাড়ীতে। কুড়িগ্রাম কলেজের মাঠ কাঁপানো ছাত্র নেতাগণ ফুলবাড়ীতে এসেছেন। আমিনুর ইসলাম, মঞ্জু মণ্ডল, শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, আক্তারুজ্জামান মণ্ডল প্রমুখ ছাত্র নেতার সাথে স্থানীয় রুহুল আমিন খন্দকার, শেখ আতাউর রহমান, আবুল হোসেন, আমি আলেপ উদ্দিন প্রামাণিক, নুরুল হুদা, দুলাল, হুমায়ন কবীর ও আরও অনেক ছাত্রনেতা এবং স্থানীয় যুবসমাজের নেতৃস্থানীয়রা একসাথে সমবেত। নির্বাচিত আওয়ামী লীগ এমপি আব্দুল হাকিমের সাথে আ. মান্নান, ইউনুছ আলী, শামসুল হক সরকার, বদরুজ্জামান মিয়া ও আরও অনেকে আছেন। আসন্ন ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবেলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ফুলবাড়ীতে সমবেত হয়েছেন সকলে।

পড়ন্ত বিকাল। হানাদার পাকিস্তানি মিলিটারি ধরলা ওপারে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে। মানুষ মারছে, বাড়ি পোড়াচ্ছে। নগর জনপদ ছারখার করে ফুলবাড়ীর দিকে এগিয়ে আসছে। ছাত্রনেতারা প্রতিরোধের আহ্বান জানালেন সকলকে। ধরলা নদীর পরিবেশগত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে পুবদিকে শক্ত প্রতিরোধ তৈরি করে ফুলবাড়ীকে শত্রুমুক্ত রাখতে হবে। ইউনুছ ভাই ছাত্রনেতাদের প্রস্তাবে গুরুত্ব দিয়ে এমপি সাহেবের পক্ষে উপস্থিত ছাত্র-যুবক, জনতাকে প্রতিরোধ যুদ্ধের সম্মিলিত আহ্বান জানিয়ে ফুলবাড়ীকে মুক্ত অঞ্চল ঘোষণা করে

জানালেন, আজকের এই ঘোষণার দাবিদার ফুলবাড়ীর মুক্তিকামী সকল জনতা ও সকল প্রতিরোধ যোদ্ধা। ফুলবাড়ীকে মুক্ত রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের। আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন। জয় বাংলা।

সূত্র: জ- ১৭৩১৮

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
প্রমিলা রায়	**আলেপ উদ্দিন প্রামাণিক**
জাগরণী বহুমুখী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম
দশম শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ, রোল : ৩	

ঘরের ভেতর ঢুকে মেয়েটিকে ধরে ফেলল

সেদিন ২৪ আগস্ট ১৯৭১-এর অপরাহ্ণ। আমাদের লিডার আবুল হোসেনের নির্দেশে সহযোদ্ধা জামাল ও জয়নালকে সাথে নিয়ে ধরলা নদীর ওপারে বড়বাড়ী এলাকায় খোদাবাগ গ্রামের বড় রাস্তার ওপর টহলদার পাকিস্তানি মিলিটারিদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ করতে যাই। উক্ত কাজ সম্পাদন করতে স্থানীয় বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন হয়। খোদাবাগের আলম নামে আমাদের এক সহযোগিতাকারীর মাধ্যমে আমরা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করি। আরও প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের প্রয়োজনে আলমের বাড়ির পাশের এক দরিদ্র কৃষকের বাড়িতে অবস্থান করি। সে বাড়ির সকলেই বাড়িছাড়া। আমরা সে বাড়িতে গোপনে কিছু নকশা তৈরির কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তখন মানুষের সাড়া পেয়ে দেখলাম এক বুড়িমা। তিনি এক যুবতীকে সাথে নিয়ে আমাদের কাছে এলেন। আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই বুড়িমা আর্তচিৎকার করে আমাদেরকে সাবধান করে পার্শ্ববর্তী হাঁস-মুরগির খামারের কাছে দ্রুত আত্মগোপনের সংকেত দিলেন। আমরা পড়িমরি করে দ্রুত মুরগির নোংরা খোয়াড়ের ওপরে ওঠে আবর্জনা দিয়ে নিজেদের ঢেকে নিলাম।

মুরগির খোয়াড়ের অদূরে বাড়িতে যাতায়াতের সংকীর্ণ রাস্তা। আমরা মুরগির খোয়াড়ে আত্মগোপন করার সাথে সাথে ভারী বুট জুতার শব্দ শুনলাম। মিলিটারিরা সংখ্যায় দশ কি বারোজন। তারা এসে বুড়িমাকে ধরে ফেলল। তিনি কোথাও পালিয়ে যাওয়ার সময় পাননি। মেয়েটিও ছোট ঘরের এক কোণায় আশ্রয় নিয়েছিল। মিলিটারি জোয়ানেরা বুড়িমাকে লাথি দিয়ে জানতে চাইল, এখানে কে এসেছিল? বুড়িমা তাদের লাথি সহ্য করে তবু আমাদেরকে ধরিয়ে দেননি। আমরা মৃত্যু নিশ্চিত জেনে মনে মনে দোয়া পড়ছিলাম।

ইতিমধ্যে কয়েকজন মিলিটারি ঘরের ভেতর ঢুকে মেয়েটিকে ধরে ফেলল। আমরা তার আর্তনাদ শুনলাম। তারপর শুধু মা-বাবা বলে চিৎকার। কান্নাকাটি ও গোঙানির শব্দ তারপর সব শেষ। ইতিমধ্যে তারা বাড়ি থেকে বের হয়ে বাইরে ঘরের বেড়ায় পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘরের ভেতর আগুন ধরার আগেই বুড়িমাকে অচেতন অবস্থায় ঘর থেকে বের করি। নির্যাতিতা মেয়ে ও বুড়িমাকে গ্রামর এক প্রবীণ ব্যক্তিকে দেখতে বলে সেখান থেকে চলে এলাম। সন্ধ্যায় আলমসহ অন্য ভাইদের সাথে দেখা হয়।

যুদ্ধের দীর্ঘ ৩৮ বছর পরও সেই বুড়িমা ও নির্যাতিতা মেয়েটির করুণ আর্তনাদ এখনো যেন শুনতে পাই।

সূত্র: জ- ১৭৩২০

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
রিফাহ্ তাসনিয়া (রেশমী)	**মোহাম্মদ আলী (মুক্তিযোদ্ধা)**
জাগরণী বহুমুখী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : পানিমাছ কুটি, উপজেলা : ফুলবাড়ী
অষ্টম শ্রেণি, ক শাখা, রোল : ৩	জেলা : কুড়িগ্রাম

গুলির বাক্স খুব ভারী ছিল

মুক্তিযুদ্ধকালীন তার বয়স ছিল ১২-১৩ বছর। সে ও তার এক ভাইসহ নেওয়াশী মেরুয়া বিলের ধারে মহিষ চরাচ্ছিল। উত্তর দিকে ভারত থেকে আসা মিত্রবাহিনী তাদের সামনে পড়ে। তখন তারা মনে করেছিল পাকবাহিনী। পরে মিত্রবাহিনী তাদের দুজনের মাথায় তুলে দেয় গুলির বাক্স। খুব ভারী ছিল। খুব কষ্ট করে তারা তাদের সাথে এসে নেওয়াশী বাজার-সংলগ্ন তফাজ্জল সরকারের বাসায় থামে বিশ্রামের জন্য। ওই বাসায় এসে তারা ভারী গুলির বাক্স নামিয়ে নেয়। মিত্রবাহিনী তাদেরকে উপকার করার জন্য মোটা পুরু একটা করে রুটি ও মাংসের টুকরা দেয়। বালতি দিয়ে কুয়ার পানি তুলে তারা তৃষ্ণা নিবারণ করে। তারা ব্যাপারি হাটের দিকে রওনা দেয় পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে।

সূত্র: জ-৩১৮৮

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
শিউলী খাতুন	**আবু হানিফ তালুকদার**
জাগরণী বহুমুখী বালিকা বিদ্যাবিথী উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স : ৪৮ বছর
৯ম শ্রেণি, ব্যবসায় শিক্ষা, রোল : ১৪	
নেওয়াশী, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম	

বাংলার ভয়াবহ দৃশ্য

১৯৭১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস, মঙ্গলবার। আমের দিন। দুলাভাই আবদুস ছামাদ আম খেতে গেছেন সন্তোষপুর থেকে রায়গঞ্জ ভৈরবির পারে তার দোস্ত শামসুদ্দিনের বাড়ি। দোস্তের বাড়িতে তিনজন লোক ছিল। কাজের লোক, তার দোস্ত ও তিনি নিজে। পাকবাহিনীর অত্যাচারের ভয়ে বাড়িতে কোনো মহিলা থাকতে পারত না। ওই দিন সকালবেলা নাস্তার জন্য চাল ভেজে গামলার পানিতে ভিজিয়ে রাখে। ইতিমধ্যে তিনজন পাকসেনা বাড়িতে ঢুকে পড়ে এবং চাল ভাজা ভিজানো দেখে লাঠি দিয়ে ঠকঠক করে জিজ্ঞেস করে, ইয়ে কেয়া চিজ হ্যায়? তখন দুলাভাই কেবল মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্র ছিল। তাদের এই উর্দু কথার জবাব দিল ভয়ে ভয়ে, এ মেরে খানা হ্যায়।

তারপর জিগা গাছের ডাল ভেঙে বাড়ির সমস্ত হাঁস মুরগিকে ধাওয়া করে পাকসেনারা এবং তাদেরকে বলে, এই ছোকরা পাকড়াও। দুলাভাইরা হাঁস-মুরগিগুলোকে ধরে তাদের কাছে একটা একটা করে তুলে দেয়। তারা একত্রে ওগুলো রশি দিয়ে বেঁধে তাদের হাতে বহন করতে দেয় এবং তাদের সাথে যেতে বলে। রায়গঞ্জ পুলের নিচে পাকবাহিনীর বিশাল বাংকার করা ক্যাম্পে তাদের চলাচলের জন্য রাস্তা করতে বলে। জীবন বাঁচানোর জন্য ভয়ে ওদের কথা শুনতে বাধ্য হয়। বিশাল বাংকারে গিয়ে দেখে আশপাশের গ্রাম থেকে বহু মহিলা ধরে এনে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় আমোদ ফুর্তি করছে খানেরা। এই জঘন্য দৃশ্য দেখে তাদের আফসোসের সীমা ছিল না। মহিলারা কিছু বললে গুলি করে হত্যা করা হতো। তারপর দুলাভাইদের ছেড়ে দেয় বিকালবেলা।

বাড়ি ফেরার পথে ওই তিনজনকে পাকসেনাদের পাঁচ সদস্য আবার আটকায়। ওই পাক ফৌজদের সাথে ছিল অনেক ছাগল। দুলাভাই রাস্তায় আম খায়। আমগুলো পকেটে দেখে রাইফেল উঁচিয়ে বলে, ইয়ে কিয়া চিজ হ্যায়? দুলাভাই বলেন, ইয়ে ম্যাংগো হ্যায় এবং বের করে দেয় আমগুলো। পাকসেনা পুনরায় বুকে রাইফেল ধরে বলে, বাঙালি ফৌজ কাহা হ্যায়? দুলাভাই বলেন, বাঙালি ফৌজ কাহা হ্যায় মুজহে মালুমনিহি। পাকসেনা বলে, তোম বাঙালি ফৌজকা বাচ্চা হ্যায়। আবার রেগে বলে, তোম ছাচকাহ ছোর দেংগা, ঝুট কাহাতো তোমকো সুট করেঙ্গা। ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে দুলাভাই বলেন, আল্লাহ কি কছম কর কাহাতা হ্যায়, বাঙালি ফৌজ মুজহে মালুম নিহি। তারা জিজ্ঞেস করে তুমি কোথায় উর্দু শিখেছ। দুলাভাই বলেন, মাই মাদ্রাসা কি তালবে এলেমহো। তারা রাইফেল নামায় এবং বলে, পাকসেনা তোমহারা দোস্ত হায়।

একটি আহত ছাগল তাদেরকে দিয়ে দেয়।

সূত্র: জ-২৮১৬

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
শাপলা মনি	**মৌলভী আবদুস ছামাদ**
জাগরণী বহুমুখী বালিকা বিদ্যাবিথী উচ্চবিদ্যালয়	বয়স : ৫০, সম্পর্ক : দুলাভাই নেওয়াশী, কুড়িগ্রাম
অষ্টম শ্রেণি, রোল : ৩, ক শাখা	

জঘন্য ঘটনা

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক পৈশাচিক বর্বরোচিত ঘটনা ঘটেছে পাকসেনাদের দ্বারা। সে কথা ভাবলে খুব কষ্ট হয়। তাদের এই পৈশাচিক বর্বরোচিত ঘটনার একটি চিত্র তুলে ধরা হলো।

তখন ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের কোনো এক মঙ্গলবার। রায়গঞ্জ হাটের দিন। পাকসেনাদের বাংকার ছিল রায়গঞ্জ পুলের নিচে। একদিন কয়েকজন পাকসেনা ভৈরবির পারের দক্ষিণ-পূর্ব কোনা গ্রামে অপারেশনে যায়। সেখানে কয়েকটি বাড়িতে হানা দেয়। তারা বাড়ির পুরুষদের বলে, লাড়কি নিয়ে এসো। তারা রাজি না হওয়ায় তাদেরকে প্রচণ্ড মারপিট করে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে। তাদের দেখে মহিলারা পালানোর চেষ্টা করে। পাকসেনারা ঘরে ঢুকে কয়েকজন মহিলাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। ধর্ষিতাদের মধ্যে ওই বাড়ির বড় বউ আব্দুস সামাদের এক ফুফু মারাত্মকভাবে আহত হয়। পাকসেনারা চলে যাওয়ার পর গ্রাম্য ডাক্তারের চিকিৎসা দেয়া হয় তাকে। ওই বাড়ির কর্তা অর্থাৎ বড় বউয়ের শ্বশুর ওই ঘটনা সহ্য করতে না পেরে জীবন বাজি রেখে মাওলানা আব্দুল হকের হাতে লেখা অভিযোগ উর্দুতে লিখে এনে নাগেশ্বরী পাকসেনাদের হেড ক্যাম্পের অধিনায়ক মেজর আতাউল্লাহ খানের হাতে জমা দেন এবং ধর্ষণের সুবিচার চান। আতাউল্লাহ খান ওই বৃদ্ধকে তার গাড়িতে করে ওই বাড়িতে যান সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য। ঘটনা সত্যি জেনে ওই বৃদ্ধ এবং গ্রামের কয়েকজনসহ তথ্যদাতা মৌলবি আব্দুস সামাদ ওই জিপ গাড়িতে রায়গঞ্জ পুলের নিচে ওই বাংকারে যায়। বৃদ্ধকে মেজর আতাউল্লাহ বলেন, কোন কোন পাকসেনা ধর্ষণ করেছে তাদের শনাক্ত করে দাও। বৃদ্ধ ওই পাঁচ জনকে খুঁজে বের করে দেন। তিনি এক এক করে তাদেরকে বুট পায়ে লাথি মারেন এবং পুলের উপর তারা পড়ে যায়। লাথির আঘাতে দুজনের মাথা কংক্রিটের সাথে লেগে ফেটে যায়।

পাকসেনাদের অত্যাচারের কথা স্মরণে উঠলে আজও বুক কেঁপে ওঠে।

সূত্র: জ-২৮১৭

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
জেসমিন আক্তার	**মৌলভী আবদুস সামাদ**
জাগরণী বহুমুখী বালিকা বিদ্যাবিথী উচ্চবিদ্যালয়	নেওয়াশী, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম বয়স : ৫০, সম্পর্ক : দুলাভাই
অষ্টম শ্রেণি, ক শাখা, রোল : ৭	

হারাইয়া গেলো গা তর বু

আমি একদিন আমার আম্মার সাথে শুইয়া আছি। আম্মারে কইলাম, আম্মা তুমি সংরামের কথা কবার পাও না। আম্মা কইল, তা কবার পাম না কেন! আমি কইলাম, একটা দুঃখের কাহিনী কওছেন। তহন আমার আম্মা বড় কইরা নিঃশ্বাস ছাইড়া চোখে পানি আহে আহে অবস্থায় আমারে কইল, আর সে কথা কইশনারে বাবা, এহনো

কইলে আমার মনে হয় আমার বুকটা ফাইটা যায়। এ কথা শুনে আমি আম্মারে কইলাম কাইন্দোনা আম্মা, তুমি আমারে কও। তহন আম্মা কাইন্দা কাইন্দা কইল–

তর বুরে আমরা তহন হারাইয়া ফালাইছি। আমরা দাদিরে বু কইরা কইতাম। তহন আমি কইলাম কিবা কইরা আমার বুরে হারাইছি কও আম্মা কও। তহন আমার আম্মা কইল, যহন আংগর বাড়ি নদীর ওপার আছিল চর বারইটারী। তহন সংরাম শুরু হইছিল। তহন একদিন আমি কেবই সকাল বেলা ভাত হাইসেলে তুইলা দিছি। এমমেরে দিয়ে দেহি বিহারিরা আইয়ে। আংগর বাড়ি থাইকা পশ্চিমে নদী। এই নদীর এপার থাইকা গুলি করতাছে। এই গুলির শব্দ শুইনা আংগর বাড়ির সোজা পূর্ব বাংলার ক্যাম্প থাইকা কামানের গুলি ছাড়তাছে। সেই কামানের গুলির কী তার শব্দ! সেইডা গুলি আইতাছে নাতো সেডা যেন এক পাল ভোমরা ভো ভো কইরা আইতাছে। এই না দেইহা আমি সবারে কইলাম যে, তোমরা আস, আমরা সবাই দক্ষিণে পাটের ক্ষেতের মুহি যাইয়া থাহি। তহন তোর চাচা চাচি তোর আব্বা সবাই দক্ষিণে পাটের ক্ষেতের মুহি গেলাম। আম্মারে তোর 'বু', আবার কী করছে, আংগর বাড়ির পাছমুরে পাটের ক্ষেতের সঙ্গে এডা বরই গাছ আছিল, সেই বরই গাছ ধইরা বইয়া আছে। আমরা তো সবাই দক্ষিণে পাটের ক্ষেতে গেছি। তর বুতো যায় নাই। এহন গোলাগুলি তো শুরু খুব হইছে। এহন তর বুরে কহন নিবার যাই। এহন তো আমরা চিন্তায় মইয়া যাই। কিন্তু বাড়ি তো যাবার পাই না। গুলাগুলি চলতাছে খুব আংগর বাড়ির ওপর দিয়ে গুলি ভোমবার নাকলী কইরে গেতাছে। এবা চলতে চলতে একটা গুলি আইয়া আংগর বাড়ির পাছে পড়ল। গুলি তর বুর ওপরে পড়ছে না তো মানে তর বুর পাছমিরে পাটের ক্ষেতে পড়ছে। সেইডা আছিল কামানের গুলি। গুলিডে পইরা ফাটছে। এমমুহি আমরা তো চিন্তায় এহেবারে কাতল। সেই গুলিডের কিছু আগুনের ছিট তোর বুর শরীলে লাগছিল। আমি কইলাম তারপর কি হইল আম্মা। আমার আম্মা কইল যে খারাইয়া কইতাছি। তারপর আমরা তো পাটের ক্ষেতের একমিরে তনে সব দেখতাছি। তর আব্বা আর তর চাচা তো খালি ফিট হইয়া দেতাছে। আমি কইলাম আম্মা কইল তারপাছে বিহেলের মুহি গুলি বন্ধ হইল।

তারপর আমরা বাড়ির মুহি গেলাম। যাইয়া তর বুরে খুঁজতাছি। খুঁজতে খুঁজতে তর জামাল ভাই যাইয়া দেহে আংগর বাড়ির পাছমইরে বরই গাছ তলে পইড়া আছে। তর বুরে দেইখা জামাল উদ্দিন চিৎকার মারছে। তহন আমরা সবাই যাইয়া দেহি পইড়া আছে। তহন সবাই ধরাধরি কইরা বাড়িতে আনলাম। আইনা দেহি বাঁইচা আছে। কিন্তু বাঁইচা থাইকা কী হবো এবি তো বুইড়া মানুষ, আবার আগুনের ছিটে পুইড়া গেছে। এরাম কয়দিন থাকতে থাকতে ২৮ দিন পরে মইরা গেছে। এইভাবে তর বুরে আমরা হারাইয়া ফালাইছি।

আমি কইলাম, তার পাছে কী হইছে আম্মা। তার পাছে আমার আম্মা কইল কান্দাকান্দি অবস্থায়। তার পাছে আর কী হব। তার পাছে তর বুর মুখ আমরা সারাজীবনের জন্য হারাইয়া ফালাইলাম। সারাজীবনের জন্য তর বু, আংগর সামনে থাইকা হরায়া গেলোগা। হারাইয়া গেলোগা আংগর সামনে থাইকা তর বু।

সূত্র: জ-৪৪৫১

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. মোস্তফা কামাল (রঞ্জু)	**জায়েদা বেগম**
ইংলিশ টিউটোরিয়াল কোচিং সেন্টার	গ্রাম : সুখাতী দিঘির পার
দশম শ্রেণি	পো : সুখাতী, থানা : নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
	সম্পর্ক : আম্মা, বয়স : ৫৫

দুঃখের বিষয় মাইন বিস্ফোরিত হলো না

পাকবাহিনী যখন বাংলার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে নর-নারী হত্যা, নির্যাতন, লুটতরাজ ও ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া শুরু করল তখন বাবা-মা, ভাই-বোন নিয়ে ভারতে চলে যাই। আমি ছিলাম ছাত্র। ভারতের দীনহাটা, রামবাড়ী

ক্যাম্পে আশ্রয় লাভ করি। ক্যাম্পে বসে বসে আতপের ভাত খাই। আর রেডিও শুনি। ক্যাম্পে বসে বসে খাওয়া ভালো লাগল না। আমি হরেন্দ্রনাথ, বাবুল আর অমল কুচবিহার হতে পালিয়ে যাই। হরেন্দ্র আর আমি গাড়িতে উঠি কুচবিহার হতে। নিওমাল জংশন স্থানে আমাদের গাড়ি পাহাড়ের ওপর উঠল। একটানা গাড়ি চলে পরদিন সকাল ১০টায় দার্জিলিং চুজিব ক্যাম্পে পৌঁছি। পরদিন থেকে ট্রেনিং শুরু হয়। দুঃখের শেষ নেই। কারণ, ভারতের ওস্তাদেরা একটানা কথা বলতে থাকে। আমরা বুঝতে পারি না। তখন আমাদের শাস্তি দেয়া হয়। ফলটানা, ঢারজু চাউল এমন অনেক ধরনের শাস্তি হয়। অনেক চেষ্টার মাধ্যমে একটি মাস ট্রেনিং নিলাম। আদেশ হলো যুদ্ধে যাওয়ার। গাড়িতে উঠলাম সকাল ১০টায়। নিওমাল জংশনে গাড়িতে করে ধুবড়ি যাই। স্টিমারে নদী পার হয়ে মানকেরচর হয়ে রৌমারী গেলাম। তখন কোম্পানি ভাগ হয়। আমাদের কোম্পানি কমান্ডার খায়রুল আলম। চাঁদ মিঞা, লাল মিঞা ও পচু মিঞা এই তিনজন হলো প্লাটুন কমান্ডার। আমি ছিলাম লাল মিঞার প্লাটুনে। আমরা প্লাটুন থেকে অ্যাম্বুশ করে ব্রিজ ভেঙে সাতজন রাজাকার ধরি। খায়রুল আলম কোম্পানি চাঁদ মিঞা, লাল মিঞা ও পচু মিঞার প্লাটুন নিয়ে নদী পার হয়ে বকশীগঞ্জ নামক স্থানে হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে। রাত্রিতে আমরা দুর্গাপুর হতে চিলমারী পর্যন্ত এলাকা অপারেশন করি। দিন রাত্রিতে কোনো অবসর নাই।

যুদ্ধ আর যুদ্ধ। গোয়েন্দা জানাল যে, পাকবাহিনী গাড়িযোগে চিলমারী যাচ্ছে। আমাদের কমান্ডার লাল মিঞা খুবই সাহসী। সেই সময়ের মধ্যে তিনি আমাদের নিয়ে হালাবটের উত্তরে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে রেললাইনের নিচে মাইন বসিয়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। সকাল ১০টার দিকে পাকবাহিনী গাড়ি নিয়ে চিলমারী রওনা দিল। কমান্ডার আদেশ দিল গাড়ি ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত পজিশন উইথড্র করা যাবে না। আবার দুটি মাইন বসানো হলো। গাড়ি ফিরে গেল কুড়িগ্রাম। দুঃখের বিষয়, মাইন বিস্ফোরণ হলো না।

ওই দিন না খাওয়া অবস্থায় রাতটিও কেটে গেল। লাল মিঞা অটল। সে বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত গাড়ি ধ্বংস না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ কোথাও যেতে পারবে না। আবার মাইন বসানো হলো। রাত্রি গেল। পরদিনও তাদের গাড়ি কুড়িগ্রাম থেকে উলিপুর গেল। কোনো কাজ হলো না। কমান্ডার খাওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। আমরা সবাই থালা হাতে নিয়ে পায়চারি করছি আর খাচ্ছি। উলিপুর থেকে গাড়ি ফেরত এলো। আর সঙ্গে সঙ্গে মাইন বিস্ফোরিত হয়ে গাড়ি উল্টে গেল। তখন উভয় পক্ষে গোলাগুলি শুরু হলো।

এদিকে আমরা গাড়ি চেক করব বলে আশা করছি। এমন সময় কুড়িগ্রাম হতে একদল পাকসেনা মঘলগাছা হয়ে আমাদের পেছনে আক্রমণ করল। তখন আমরা সবাই দিশাহারা হয়ে যাই। আমি আর আমার সঙ্গী মানিক এক সাথে ছিলাম। আমাদের পেছনে ইয়ালি ইয়ালি শব্দ শোনা যায়। পেছনে ফিরে দেখি পাকবাহিনী। হঠাৎ এক পাকসেনা আমার সঙ্গী মানিকের হাত ধরল। মানিকের হাতে ছিল গুলির বাক্স। মানিক তৎক্ষণাৎ পাকসেনার পায়ে গুলির বাক্স ফেলে দিল। তখন মানিককে ছেড়ে দিয়ে তার পা ধরে আর্তনাদ করছে। এই সুযোগে মানিক দৌড়ে পালিয়ে গেল। পাকবাহিনীদের মতলব ছিল আমাদের ধরার। গুলি করলে আমাদের মারতে পারত। কিন্তু কেন যে গুলি করেনি বুঝলাম না। তারপর যখন মানিককে ধরতে পারল না তখন তারা আমার পেছনে দৌড় দিলো। সে অবস্থায় আমার সঙ্গে ছিল একটা সাধারণ লোক। ভাগ্যক্রমে পাকবাহিনী আমার পেছন ছেড়ে সেই সাধারণ লোকটার পেছনে দৌড় দিল। ওই সুযোগে আমি এক পানা ভরা ডোবাতে নিঃশব্দে নেমে পড়ি। পানা মাথায় দিয়ে শুধু নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য নাক জাগিয়ে রাখি। পাকসেনা মুক্তিদের না পেয়ে আগুন দিয়ে বাড়ি পুড়িয়ে দিল এবং অনেক লোককে নির্যাতন করল এবং গুলি করল।

অন্ধকার নামল কিন্তু ডোবা থেকে ওঠার সাহস পাচ্ছিলাম না। কারণ আমার জানা নেই শত্রুরা কোথায় কী অবস্থায় আছে। তবু মনের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে ডোবা হতে উঠি। ঠাণ্ডায় থাকতে পারছিলাম না। ঠাণ্ডাকে চেক দেওয়ার জন্য বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া আগুনের তাপ নিলাম। আনুমানিক রাত একটা হবে। আমরা যে বাড়িতে ছিলাম সে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। ঘোর অন্ধকার কিছু দেখা যায় না।

ঠিক সূর্য ওঠার পূর্ব মুহূর্তে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, আমার সঙ্গী আমার ভাইয়েরা মর্মাহত হয়ে বসে আছে। আমাকে দেখে সবাই অবাক। সবাই জানে আমি মরে গেছি।

সেক্টর নম্বার ১১ হাতিয়া আক্রমণ করল, দিনটি ছিল শুক্রবার। কোম্পানি কমান্ডার খায়রুল আলম, লাল মিঞা ও কমান্ডার পচু মিঞা আরও মুক্তিসেনা সবাই মানকেরচর গিয়েছিল। আমরা সাতজন মুক্তিসেনা মধুপুর ফজল মেম্বারের বাড়িতে ছিলাম।

মাদারটারী গ্রামে ছিল পাঁচজন, মণ্ডলের হাটে এগারোজন, এই ছিল সেদিনকার মুক্তিসেনা। ওই দিন ভোর রাতে পাকবাহিনী মণ্ডলের হাট আক্রমণ করলো। এতে মারা যান তিনজন আরও কিছু নাম না জানা লোক আহত হন। আমরা মনে করেছি যে হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করবে। অবশ্যই যুদ্ধ হবে। কিন্তু কোনো শব্দ শোনা গেল না। শুধু পাকসেনার এলএমজির শব্দ শোনা গেল। বহু লোক মারা গেল। আমরা উপায় না পেয়ে আত্মগোপনে ছিলাম। কয়েক দিন পরে ভারতের মিত্রবাহিনী আমাদের সাথে যোগ দিল। এতে অল্প দিনের মধ্যে কুড়িগ্রাম উলিপুর মুক্ত হলো।

এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর দেশটি শত্রুমুক্ত হয়। আমরা তখন ছিলাম উলিপুর। উলিপুর থেকে গাইবান্ধায় গিয়ে হাতিয়ার জমা দিয়ে বাড়ি চলে আসি।

সূত্র: জ-১২৩৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
বেলী রায়	**রামচন্দ্র রায় (বীর মুক্তিযোদ্ধা)**
মীর ইসমাইল হোসেন ডিগ্রি কলেজ	গ্রাম : রতিরাম কমলওঝা, পোস্ট : নীলের কুটি
একাদশ শ্রেণি, রোল : ১৩৩	রাজারহাট, জেলা : কুড়িগ্রাম

ডাক্তার তারাকান্ত বাবুকে পুনরায় গুলি করে

পাকবাহিনী কোন এলাকা দখল করলে সেই এলাকার নিরীহ মানুষের প্রতি অমানবিক নির্যাতন চালাত। হত্যা-লুণ্ঠন ধর্ষণ এগুলো ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। পাকসেনাদের প্রথম টার্গেট ছিল হিন্দু। কোনো এলাকার অধিবাসী হিন্দু এ কথা জানতে পারলে তাদেরকে ধরে নিয়ে গুলি করে হত্যা করত। এমনি এক নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন কুড়িগ্রাম জেলার স্বনামধন্য ডাক্তার তারাকান্ত ভৌমিক ওরফে তারা বাবু ।

পাকসেনাদের হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা ভারতে চলে যায়। কিন্তু তারাকান্ত ভৌমিক এবং তার সহচর শ্যালক শুকেশ চন্দ্র দেশেই থেকে যান। তাঁকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, আমি চলে গেলে অসুস্থ রোগীর সেবা কে করবে? তিনি অতি সাধারণ জীবন-যাপান করতেন এবং বিনা পয়সায় মানুষের সেবা করতেন। এতো ভালো মানুষ হয়েও তিনি বর্বর পাকিস্তানি সেনাদের হাত থেকে রেহাই পাননি।

ডাক্তার বাবু বাড়িতে থাকা অবস্থায় একদিন পাকসেনারা ভিতরবন্দ এলাকায় অপারেশনে আসে। ভিতরবন্দ বাজারে উপস্থিত হয়ে কয়েকটি ছেলেকে ডাব পাড়ার জন্য তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। ছেলেরা কাউকে জিজ্ঞাসা না করে ডাব পাড়ার জন্য গাছে চড়লে শুকেশ চন্দ্র দিঘিতে গোসল করা অবস্থায় ছেলেদেরকে ডাব পাড়তে নিষেধ করে। ছেলেরা ফেরত গিয়ে পাকসেনাদের জানালে সঙ্গে সঙ্গে দুই পাকসেনা এসে শুকেশ চন্দকে ধরে বেদম মারধর করে। ওই মুহূর্তে ডা. তারাকান্ত ঘর থেকে আঙিনায় এলে তাঁকেও ধরে বেদম মারধর করে এবং ভিতরবন্দ বাজারে নিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে আবারও বেদম মারধর করলে তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। এমতাবস্থায় আরও কিছুসংখ্যক লোকজনকে ধরে ট্রাকে করে নাগেশ্বরী নিয়ে গিয়ে লাইন করে গুলি করে হত্যা করে।

তারপরে জনৈক ব্যক্তিকে পাকসেনারা হুকুম করে এদেরকে গর্ত খুঁড়ে চাপা দিতে। ওই ব্যক্তি গর্ত করার পর লাশগুলোকে এক এক করে গর্তে ফেলতে থাকে। কিন্তু ডা. তারাকান্ত বাবুর তখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়নি। তাঁকে জীবিত দেখে ওই ব্যক্তি পাকসেনাদেরকে বলে, একজন জীবিত আছে। তৎক্ষণাৎ পাকসেনা এসে ডা. তারাকান্ত বাবুকে পুনরায় গুলি করে হত্যা করে মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়।

পরবর্তী সময়ে ডা. তারাকান্ত বাবুর ওয়ারিশগণ নাগেশ্বরী ঈদগাহ ময়দানের দক্ষিণ দিকে একটি স্মৃতিসৌধ স্থাপন করে। ডা. তারাকান্ত বাবুর মতো একজন মহান দয়ালু চিকিৎসকও বর্বর পাকবাহিনীর হাত থেকে রেহাই পাননি।

এসব হত্যাকাণ্ডের জন্য দোষীদের বিচার হওয়া দরকার।

সূত্র: জ- ৪৪৩৬

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
রুহুল আমিন মণ্ডল	**মো. আব্দুর রহমান**
ভিতরবন্দ স্নাতক মহাবিদ্যালয়	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য
দ্বাদশ শ্রেণি, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম	ভিতরবন্দ স্নাতক মহাবিদ্যালয়
	নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম

শুরু হলো হাতাহাতি লড়াই

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে কাপুরুষ পাকিস্তানি সৈন্যরা নিরীহ বাঙালি জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যে হত্যাযজ্ঞের সূচনা করে তা ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। বাংলাদেশের বীর জনগণ প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেও অল্প দিনের মধ্যেই তারা এর পালটা প্রতিশোধ নিতে শুরু করে।

আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। পাকিস্তান আমলে আনসার হিসেবে যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ে আমার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা ছিল। আমার বয়স তখন প্রায় ৩০ বছর। আমাদের মেঘালয় রেঞ্জে মুক্তিযোদ্ধার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে আমি সুইসাইড স্কোয়াডে সংযুক্ত হই।

তখন সময়টা ছিল নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও ভারত সীমান্তে তুমুল যুদ্ধ চলছিল। সেই সময় ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট সীমান্তের সন্নিকটে নকলী পিওপিতে পাকবাহিনীর পাঞ্জাব রেজিমেন্টের শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। সেই ঘাঁটি থাকায় আমরা মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও ময়মনসিংহ শহরের দিকে অগ্রসর হতে পারছিলাম না। অতএব যেভাবেই হোক পাক-পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এই শক্তিশালী ঘাঁটি দখল করে নিতেই হবে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর হুকুম হলো, এই ঘাঁটি দখল করার জন্য। কিন্তু আমাদের ভারী অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। সুতরাং গারো হিলের চূড়ায় কর্মরত ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি গুর্খা রেজিমেন্টকে উক্ত পাকিস্তানি ঘাঁটি দখল অথবা ধ্বংস করার জন্য নিয়োগ করবেন। যোদ্ধা হিসেবে গুর্খা বাহিনীর প্রচুর সুনাম রয়েছে। যা হোক, গুর্খা বাহিনী পাকবাহিনীর ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করল। পাকিস্তানি বাহিনীও প্রচণ্ড জবাব দিতে শুরু করল। গুর্খা বাহিনী তাদের বাংকার ত্যাগ করে গোলাগুলির মধ্যেও ইয়া গুর্খালি, ইয়া গুর্খালি বলে অগ্রসর হতে শুরু করল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গুর্খা বাহিনী পাকিস্তানি আক্রমণের প্রচণ্ডতায় টিকতে পারল না। গুর্খা বাহিনীর প্রচুর জওয়ান নিহত ও আহত হলো। শেষ পর্যন্ত উপায় না দেখে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর উক্ত পাকিস্তানি ঘাঁটি আক্রমণের জন্য আদেশ হলো। আমরা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, আনসার, ছাত্র যুবক ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত বীর মুক্তিযোদ্ধারা আল্লাহু আকবর স্লোগান দিতে দিতে মরণপণ করে প্রচণ্ড গতিতে অগ্রসর হতে লাগলাম। পাকবাহিনীর প্রচণ্ড গোলাগুলির মুখে আমাদের অনেক জওয়ান শহিদ ও আহত হলো। আমি গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলাম। আমরা তিন দিক থেকে আক্রমণ করেছিলাম। অবশেষে পাকিস্তানি ঘাঁটির ওপর আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম। শুরু হলো শত্রুদের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই। বহু পাঞ্জাবি সৈন্য নিহত হলো। অনেকেই আহত হলো। আমাদের মধ্যেও অনেক বীর যোদ্ধা শহিদ হলো। শেষ পর্যন্ত আমরা পাকিস্তানি ঘাঁটি দখল করলাম। পাকিস্তানি বাহিনীর বহু অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হলো। পাকবাহিনীর যারা জীবিত ছিল তারা পালিয়ে গেল।

সূত্র: জ-৩০৪৩

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. মেহেদী হাসান	**মো. নুরুল**
ভুরুঙ্গামারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	সম্পর্ক : দাদা

কিন্তু গুলি খেয়েও তিনি মারা যাননি

১৯৭১ সাল। আমার বয়স তখন ৯-১০ বছর। মুরব্বিদের কাছে শুনে আসছিলাম দেশে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। হঠাৎ একদিন বেলা আনুমানিক সকাল ১১টার সময় সিঅ্যান্ডবি রাস্তা ধরে খানসেনারা ভুরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী ও ফুলবাড়ী থানায় ঢুকে পড়ে। তারা ভুরুঙ্গামারীতে আসার সময় বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ করে এবং রাস্তার দুই পাশের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। ওই দিন দেওয়ানের খামার থেকে অনেক আত্মীয়স্বজন আমাদের বাড়িতে এসে আশ্রয় নেয়। বিকাল বেলা শোনা গেল খানসেনারা শান্তির বাণী ছড়াচ্ছে। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ পাশে ছিল বিশাল ফাঁকা জায়গা। বাকি তিন পাশ ছিল ঝোপঝাড় দ্বারা বেষ্টিত। সে জন্যই বেশ কিছু আত্মীয়স্বজন আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। তিন-চার দিন থাকার পর আমাদের মসজিদের জুম্মার ইমাম সাহেব বললেন, এত লোক এক সঙ্গে বসবাস করা ঠিক নয়। আপনারা যার যার সুবিধাজনক জায়গায় চলে যান। দু-এক ঘর লোক ছাড়া বাকি সবাই আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। মুক্তিবাহিনী ও খানসেনাদের মধ্যে যখন গোলাগুলি শুরু হতো তখন আমরা সবাই বাড়ির পেছনের পুকুরটায় শুয়ে থাকতাম। একদিন ইমাম সাহেব বললেন, বাড়ির কিছু জিনিসপত্র জঙ্গলে অথবা পাটের ক্ষেতে লুকিয়ে রাখেন, কারণ খানসেনারা হঠাৎ এসে যদি বাড়ি জ্বালিয়ে দেয় তাহলে শুধু জীবন নিয়ে চলে যেতে হবে।

খানসেনারা ভুরুঙ্গামারী পৌঁছার ৪-৫ দিন পরের কথা। সকাল ৮টার সময় আমি এবং বাবা বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখছি। এদিকে আমার মা থালায় ভাত দিয়ে আমাদের ডাকছেন খাওয়ার জন্য। এমন সময় দেখলাম, একজন লোক আমাদের বাড়ির দিকে পাগলের মতো দৌড়ে আসছে। তার সম্পূর্ণ শরীর রক্তে ভেজা। নাভি সোজায় একটা গামছা বাঁধা। সে এসেই আমার বাবার পায়ে পড়ে বলতে লাগল, আমার তৈয়ব আলী বাবাকে দেখাও। লোকটা সম্পর্কে আমার বাবার মামাশ্বশুর। তার নাম ইব্রাহিম। তার পুত্র তৈয়ব আলীরা দুই দিন আগে আমাদের বাড়ি ছেড়ে দক্ষিণপাড়া জব্বার মৌলবির বাড়িতে চলে গেছে। আমার বাবা শুধু হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন, ওই জব্বার মৌলবির বাড়িতে আপনার তৈয়ব আলী আছে। অমনি তিনি উঠে পাগলের মতো দক্ষিণ দিকে যেতে লাগলেন। খানেরা ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে গুলি করেছে কিন্তু গুলি খেয়েও তিনি ওই মুহূর্তে মারা যাননি। বাবা আমাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে মাকে বললেন, তাড়াতাড়ি বের হও আর থাকা যাবে না। মা ওমনি ভাতের হাঁড়ি ঢেকে রেখে ঘরের দরজা বন্ধ করে বাড়ির পেছন দিয়ে বের হলেন। বিস্কুটের টিনের এক টিন চাল ও কাঁথা বালিশ নিয়ে পশ্চিম দিকে রওনা দিলাম। আমি পাঁচটা বালিশ মাথায় নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিলাম। দলে দলে মানুষ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের দিকে যাচ্ছে। আমরা দুপুরের দিকে বাউশমারী মাদ্রাসা পার হয়ে সীমান্তের কাছাকাছি এক বাড়িতে বসে জিরোচ্ছিলাম। এমন সময় দেখলাম, আমাদের পাড়ার মাছু শেখকে কয়েকজনে ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে। তাকেও খানসেনারা ধরে নিয়ে গুলি করেছে। চিকিৎসার পর বর্তমানে তিনি বেঁচে আছেন। পরে শুনতে পেলাম ইব্রাহিম সাহেব কুচবিহার হাসপাতালে মারা গেছেন। মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র তৈয়ব আলীকে দেখতে পেয়েছিলেন কিনা তা জানা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ওই স্মৃতি আজও আমি মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি। সন্ধ্যার সময় আমরা কালমাটি সীমান্তে আবুল হোসেন সাহেবের বাড়িতে চলে যাই। লোকটা খুবই ভালো। তিনি আমাদের থাকার জায়গা করে দেন। ওনার ওখানেই আমরা দীর্ঘ ৭-৮ মাস ছিলাম এবং দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর বাড়ি আসি। এসে দেখি ঘর দরজা কিছুই নেই। ছিল শুধু মাটি আর ঝোপঝাড়।

কত দুঃখ-কষ্টে আমাদের দিন গেছে তা তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে না।

সূত্রঃ জ-৩০৫১

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. শাহিনুর রহমান (রানা)	**মো. আবদুল বারী**
ভুরুঙ্গামারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	সম্পর্ক : পিতা

ষষ্ঠ শ্রেণি, রোল : ২৪ (শিমুল)

চোখের সামনে লুটিয়ে পড়ে মারা গেলেন

১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর। আমার চোখের সামনে যা ঘটেছিল সেই ঘটনাগুলো মনে পড়লে আজও গা শিউরে ওঠে। যেদিন লালমনিরহাটে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এসে শহরে আগুন ধরিয়ে দেয়, সেদিন সন্ধ্যাবেলায় পশ্চিম আকাশ আগুনে এমন লাল হয়ে ওঠে যে, তা আমাদের গ্রাম থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এবং আমাদের গ্রাম পর্যন্ত লাল রঙ ধারণ করেছিল। আর ভেসে আসছিল শুধু মানুষের আর্তনাদ ও চিৎকার। একদিকে কান্নার কলরব অন্যদিকে গুলির ফট ফট, ঠাস ঠাস আওয়াজ, আগুনের কুণ্ডলি, সব মিলে এমন করুণ অবস্থা যে, তা বলার মতো নয়। এমন ভয়ংকর শব্দ শুনে আমরাও ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ি। পুরো এলাকা শুধু কান্না আর আর্তনাদ। কাউকে সান্ত্বনা দেয়ার মতো কেউ নেই। বহু মানুষ সেদিন মারা পড়ে। ভয়ে কেউ দেখতেও যায়নি।

তারপর হঠাৎ একদিন শুনি বিকট গুলির আওয়াজ আস্তে আস্তে আমাদের এদিকেই এগিয়ে আসছে। একটু পরেই জানতে পারলাম, পাকিস্তানি সেই নরপশুরা কুড়িগ্রাম আসছে। এদিকে বাংলার দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধারাও তাদের বাধা দেয়ার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যখন পাকিস্তানি বাহিনী টগরাই হাট রেলপথ পর্যন্ত আসে তখন শুরু হয় দুই দলেরই মুখোমুখি যুদ্ধ। আমিও ছিলাম এই যুদ্ধে গুলির বাক্স নিয়ে। সেদিন কত যে গুলি আর গুলির খোসা দেখেছিলাম তার ইয়ত্তা নেই।

কারও কোনো মৃত্যু ভয় নেই। নীরবে সবাই পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেই চলেছে। এ তুমুল যুদ্ধ কিন্তু সেদিন মুক্তিবাহিনীর কাছে হার মানতে হলো তাদের। তারপর তারা ভারী ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অনেক সেনা নিয়ে কুড়িগ্রাম শহরে প্রবেশ করে। শুরু হয় কুড়িগ্রামে রক্তের বন্যা। এর মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনী কুড়িগ্রাম থেকে কাঁঠালবাড়ীতে আসে এবং বাজারে আগুন দিয়ে দোকানপাট পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। কত লোক যে মারে তার কোনো হিসেব নেই। যখন দেখলাম, কাঁঠালবাড়ীতে আর কোনো গুলির আওয়াজ নেই তখন আমি এবং আমাদের গ্রামের দুইজন ছেলে আমির ও আলম কাঁঠালবাড়ি বাজার দেখার জন্য যাচ্ছিলাম। পথে দেখতে পেলাম, দুই জন মানুষের লাশ নাড়িভুঁড়ি বের করা অবস্থায় পড়ে আছে একটা উঁচু জমির আলে। তারপর বাজারের ভেতরে গিয়ে দেখি সন্ন্যাসী গ্রামের জব্বার আলীর পুত্র জলিল। সে ছিলো তাজা তাগড়া যুবক। তার ছিল মালামালের দোকান। তাকে তার দোকানের সামনে দুইটা হাত আর একটা পা কেটে উপুড় করে ফেলে রেখেছে। দেখে ভীষণ কষ্ট হলো। তারপর দেখলাম, চায়ের দোকানি আজিম নামে এক লোক গুলি খেয়ে ঘরের পাশে পড়ে আছে। চারপাশে শুধু রক্ত আর রক্ত। আমার মনে হয় ওই সময় তার দোকানে আগুন লাগিয়ে দেয় সেই আগুনে লোকটার সারা শরীর পুড়ে এমন অবস্থা হয়ে আছে। একটা হাঁস পরিষ্কার করে আগুনে পোড়ালে যেমন হয় ঠিক তেমনি। এসব করুণ দৃশ্য দেখে দুরু দুরু মন নিয়ে বাড়িতে ফিরলাম। সেদিনেই বিকেল বেলায় আবার পাকিস্তানি বাহিনী বদিয়ত নামে এক লোকের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। তার বাড়ির পূর্ব পাশে কিছু দূরে ছিল একটা নদী। সেই নদীর ওপরে ছিল অনেকগুলো জিগার গাছের সারি। তার পাশে একটা বাঁশঝাড়। আমরা সেখানে কয়েকজন লোক ছিলাম। গোলজার, ওয়াহেদ আলী, আহম্মেদ মাস্টার, নূর ইসলাম আর নুহু খন্দকার। আমরা সবাই বদিয়ত ব্যাপারির বাড়ির আগুন দেখছিলাম, নহু খন্দকার আমার চাচা। তিনি ছিলেন একটা জিগা গাছের আড়ালে। কিন্তু গাছের বাইরে ছিল ডান পা, আর আমি ছিলাম তার ডান পাশে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ কে যেন আমাকে খুব তাড়াতাড়ি বসতে বলল। আমি অমনি শুয়ে পড়তেই ঠাস করে একটা গুলির আওয়াজ হলো। লক্ষ করে দেখি নহু চাচার লুঙ্গিসহ পেছনের মাংস নেই। রক্ত ফিনকি দিয়ে পড়ছে তিনি আমার চোখের সামনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মারা গেলেন। এসব ভাবলে আজও খুব কষ্ট হয়।

জানো বাবা, বলতে গেলে আরও অনেক কিছু বলা যায়, আমার আরও অনেক কিছু মনে আছে কিন্তু পাকিস্তানি নরপশুরা যা ঘটিয়েছে তা বলার মতো ভাষা আমার নেই।

সূত্র: জ-৮৯৮

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
সুজন আহম্মেদ বিশ্বাস	**মো. নূর ইসলাম মিঞা**
দাশের হাট উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : শিবরাম, থানা ও জেলা : কুড়িগ্রাম
শ্রেণি দশম	বয়স : ৪৫

শহিদ লে. সামাদকে দাফন করা হয়

মেজর নওয়াজিশ সাহেবের নেতৃত্বে কুড়িগ্রামেও পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে গঠিত হয় প্রতিরোধ বাহিনী। আওয়ামী লীগ নেতা আহম্মদ সাহেবের বাড়ি ছিল সব ধরনের যোগাযোগের কেন্দ্র। মার্চের শেষের দিকে অথবা এপ্রিলের প্রথম দিকে ট্রেনযোগে পাকবাহিনী কুড়িগ্রামে প্রবেশের জন্য আসে। চেংটিমারীর রেলওয়ে ব্রিজের ওপর মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে পাকবাহিনী ট্রেনের কয়েকটি বগি রেখে ইঞ্জিন নিয়ে পালায়। এতে অনেক অস্ত্র ও গোলা বারুদ মুক্তিযোদ্ধারা পেয়ে যায়। এই যুদ্ধে আমরা বেশ কিছু ছাত্র মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সাহায্য করি। কয়েক দিন পরে পাকবাহিনী প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আবারও কুড়িগ্রাম আক্রমণ করে। একদল ট্রেনযোগে আর একদল কুড়িগ্রাম রংপুরের রাস্তা ধরে অগ্রসর হয়। মেজর নওয়াজেশ টোগরাইহাটে আহম্মদ মিয়ার বাড়িতে যে ঘরটিতে থাকতেন, সেই ঘরে রকেট লাঞ্চারের গোলা নিক্ষেপ করে দেয়াল ফুটা করে। সেই চিহ্ন আজও আছে।

পাকবাহিনীর ত্রিমুখী আক্রমণে টিকতে না পেরে মুক্তিযোদ্ধারা কুড়িগ্রাম ছেড়ে দেয় এবং ধরলা নদী পার হয়। পাকবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের পিছু নেয়। উপায়ান্তর না পেয়ে তারা প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নেয়। কিছু মুক্তি ফুলবাড়ীতে করিম ধনির বাড়িতে ক্যাম্প করে। কিছু কুমারহাটে (ভারতে) ক্যাম্প করে। কিছু চলে যায় বুড়িমারী পাটগ্রাম মোঘলহাট এলাকায়। ওই সময় কুড়িগ্রাম থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য রিয়াজ উদ্দিন (ভোলা মিয়া) কুমার হাটে অফিস নেন। অফিসে মুক্তিযোদ্ধাদের নাম তালিকাভুক্ত করে। সেই দলে আমরা ছয়জন ছাত্র ছিলাম। আমি মো. আব্দুল আউয়াল, আব্দুল হক ব্যাপারী, নুরুল হক, নুরুল আমিন ইউনুছ। কুমারহাট হতে আমাদেরকে ফুলবাড়ী ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়। ফুলবাড়ীতে আবদুল আজিজের নেতৃত্বে আমরা অস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। আমরা ১২ জন ভারতের ধাপড়ারহাট ক্যাম্পে যাই। সেখানে সুবেদার আরব আলী সাহেবের কোম্পানিতে যোগ দিই। তৎকালীন ১০ ইপিআর বর্তমান ১ম রাইফেলস ব্যাটালিয়ন সেনাবাহিনীর কয়েকজন ছিল অফিসার, ছিলেন মেজর নওয়াজেশ, সাব সেক্টর কমান্ডার। ধাপড়ারহাট হতে ভারতের কন্টোলের হাটে বটগাছের নিচে ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। ফুলবাড়ী হতে কুমারহাট ধাপড়ার হাট ইত্যাদি ক্যাম্পে থাকাকালীন ছোটখাটো অসংখ্য অপারেশন করা হয়। যেমন– কাঁঠালবাড়ী-কুড়িগ্রাম সড়কে বর্তমানে সেখানে সুতার মিল তার পাশের ব্রিজটি উড়িয়ে দেয়া হয়। এই ব্রিজটির নাম হাটালী পাগলা ব্রিজ। তাছাড়া প্রতি রাতে পাকবাহিনীর ক্যাম্পে গোলাগুলি করতাম যাতে পাকবাহিনী ক্যাম্পের বাইরে আসতে না পারে। পরবর্তী সময়ে জুলাইয়ের মাঝামাঝি আমরা ভুরুঙ্গামারীর বাগভাণ্ডার বিওপিতে গিয়ে প্রতিরক্ষা নিই। আমরা ১নং প্লাটুন আর কমান্ডার আ. ওহাব পরবর্তী সময়ে সুবেদার ওয়াহাবের নেতৃত্বে এই কোম্পানি ২নং প্লাটুন ২য় বি কোম্পানি আর কমান্ডার সুবেদার বোরহান ৩নং প্লাটুন সি কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মাজহারুল সাহেব পরে ক্যাপ্টেন দেলোয়ার ও ক্যাপ্টেন মতিউর বি এবং সি কোম্পানির দায়িত্ব গ্রহণ করে। তারা পাটগ্রামে মোঘলহাট বুড়িমারী এলাকায় অবস্থান নেয়।

এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর সংগ্রামের প্রথম ব্যাচের অফিসার হলেন আব্দুল্লাহ ও আব্দুস সামাদ সাহেব। তারা যথাক্রমে সি এবং এইচ কোম্পানি কমান্ডারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এটা সম্ভবত অক্টোবরের

দিকে। ডিফেন্সে থাকার সময় রমজানের শেষের দিন অর্থাৎ ঈদের আগের রাতে ভুরুঙ্গামারী আক্রমণ করা হয় এবং সেই আক্রমণে ভুরুঙ্গামারী শত্রুমুক্ত হয়। এই আক্রমণে ভারতীয় বাহিনীর বহু সৈন্য নিহত হয় এবং পাকবাহিনীর অনেক ক্ষয়ক্ষতি ও নয় জন সৈন্য আমাদের হাতে ধরা পড়ে। পরে পাকবাহিনী নাগেশ্বরী ও রায়গঞ্জ ডিফেন্স নেয়। আমরা ভুরুঙ্গামারী হতে এসে আন্দারী ঝাড় এলাকায় ডিফেন্স নিই। আন্দারী থেকে রামগঞ্জ এলাকা দখল করার জন্য নভেম্বরের মাঝামাঝি রায়গঞ্জ আক্রমণ করি। সেই আক্রমণে সামাদ সাহেবের কোম্পানি কুড়িগ্রাম ভুরুঙ্গামারী সড়কের পূর্ব পাশ দিয়ে এবং আবদুল্লাহ সাহেবের নেতৃত্বে আমরা সড়কের পশ্চিম পাশ দিয়ে অগ্রাভিযান করি। সামাদ সাহেবের কোম্পানি যখন পাকবাহিনীর ডিফেন্সের কাছাকাছি চলে এসেছিল। বেতার যন্ত্রে আবদুল্লাহ সাহেবকে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হতে বলে। কিন্তু আবদুল্লাহ সাহেবের এই কোম্পানি আমরা পাকবাহিনীর ক্রসফায়ারে পড়ে যাই। যার কারণে আমরা অগ্রাভিযান করে আর যেতে পারিনি। এদিকে সামাদ সাহেব পাকবাহিনীর মেশিনগানের ফায়ারে মারা যান। একদিন পর নিহত সামাদ সাহেবের লাশ উদ্ধার করে জয়মনিরহাট জামে মসজিদের সামনে দাফন করা হয়।

পরবর্তী সময়ে পাকবাহিনীর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়। সেই চাপের মুখে পাকবাহিনী রায়গঞ্জ ছেড়ে নাগেশ্বরীতে পিছিয়ে আসে। আর আমরা ব্যাপারীরহাট নামক স্থানে ডিফেন্স গ্রহণ করি। ব্যাপারীরহাট ডিফেন্সে থাকাকালীন একদিন বিকাল বেলা, তারিখ জানা নেই সম্ভবত নভেম্বরের শেষ দিকে পাকবাহিনী প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করছিল। মোজাম্মেল নামে আমাদের সহযোদ্ধা পার্শ্ববর্তী একটি বাজারে গিয়েছিল কিছু বাজার করার জন্য। মোজাম্মেল যখন ফেরত আসছিল, ডিফেন্সের কাছাকাছি আসতে একটি গোলা মোজাম্মেলের কাছাকাছি পড়ে। আমরা তখন সবাই ডিফেন্সের মধ্যে এবং বাংকারের ওপর থেকে মোজাম্মেলকে দেখছিলাম। গোলা যখন মোজাম্মেলের কাছে পড়ে, সবাই ভেবেছিলাম মোজাম্মেল মারা গেছে। কিছুক্ষণ পর দেখি মোজাম্মেল পড়ে আছে। এর পর পর আরো চারটি গোলা আসে। একটি পড়ে নায়েক মিন্নত আলীর বাংকারের ওপর। আর একটি পড়ে ইউকের বাংকারের ওপর। তৃতীয়টি পড়ে জয়নালের বাংকারের ওপর এবং চতুর্থটি পড়ে আজিজ ভাইয়ের বাংকারের ওপর। বোমাগুলো যখন পড়ছিল তখন আজিজ ভাইয়ের সাথে আবুল ও আকবর এরা তিনজন বাংকারের মুখে দাঁড়িয়ে দেখছিল। এমন অবস্থায় বোমা এসে তাদের ওপর পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে এরা তিনজন শহিদ হন। আবুল এবং আকবর আপন ভাই। এদের আর কোনো ভাই-বোন ছিল না। আবুল যেদিন শহিদ হন তার আগের রাতে আবুলের একটি কন্যাসন্তান জন্ম নিয়েছিল। কন্যাকে দেখে ফেরত এসে শহিদ হন। এদের মৃত্যু সংবাদ শোনার পর আবুলের বাবা-মা বাকরুদ্ধ হয়ে যান। এবং ওদের বাবা কিছুদিন পর মারা যান। আর মা ১৯৯০ সালে মারা যান। আজিজ ভাইসহ ওদেরকে জয়মনিরহাট জামে মসজিদের সামনে সামাদ সাহেবের কবরের পাশে দাফন করা হয়।

আবুলের বাড়ি নাগেশ্বরী উপজেলার পাগলা নামক স্থানে। প্রথম গোলা যে মোজাম্মেলের কাছে পড়েছিল তার বাড়ি ফুলবাড়ী উপজেলার খরীবাড়ি নামক স্থানে। ওর শ্বশুরবাড়ি কাঁঠালবাড়ীতে। আমরা এখনো মরা মোজাম্মেল বলে ডাকি। কয়েক দিন পর আমরা নাগেশ্বরী দখল করি। পাকবাহিনী কুড়িগ্রামে এসে ডিফেন্স নেয়। আমরা পাটেশ্বরী নামক স্থানে ডিফেন্স গ্রহণ করি। ২-৩ দিন পর পাকবাহিনী মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়ে। কুড়িগ্রাম ছেড়ে তিস্তা ব্রিজের দক্ষিণ পাশে ডিফেন্স নেয় এবং ব্রিজের দক্ষিণ পাশ ভেঙে দেয়। এই সময়টা ডিসেম্বরের ৭-৮ তারিখে হবে। তিস্তা নদীর উত্তর পাশে আমাদের ডিফেন্স। দক্ষিণ পাশে পাকবাহিনীর ডিফেন্স। তিস্তা ডিফেন্সে ১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনী হঠাৎ করে সকাল বেলা সাদা পতাকা উড়ায়। রেডিওতে শুনতে পাই পাকবাহিনী রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করেছে।

তখন আমরা কাউনিয়া হয়ে মহিগঞ্জ, তাজহাট জমিদার বাড়ি এবং শেষে রংপুর পুলিশলাইন্স আসি। রংপুর সেনানিবাস ভারতীয় বাহিনীর দখলে। পাকবাহিনীর সবাই রংপুর সেনানিবাসে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকবাহিনীর কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডনের উদ্দেশে রওনা হন। রংপুর পুলিশলাইন্স সেদিন ছিল উল্লাসে মুখরিত। মুক্তিবাহিনী সেদিন গোলাগুলির মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করেছিল।

এখানে একটি কথা বলে রাখি। জুনের দিকে নাগেশ্বরীহাটে রাজাকার কমান্ডার জয়নালের নেতৃত্বে পাকবাহিনী একই পরিবারের ১৩ জন মানুষসহ বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল। পরে আমরা খবর পেয়ে সেখানে যাই এবং কিছু লোকজন ডেকে তাদেরকে দাফন করি। এখন সেখানে ১৩টি কবর সারিবদ্ধভাবে রয়েছে। অনেক ঘটনা ঘটেছে যা আজ স্মরণ করতে পারি না। কারণ, এতো বছর পর স্মরণ করে রাখা খুবই কষ্টের। আমার জানা মতে, বর্তমান মেজর (অব.) আবদুল্লাহর কাছে কিছু কাগজপত্র এবং শহিদ সামাদের ছবি আছে। নওয়াজিশ সাহেবের স্ত্রীর কাছেও কিছু কাগজপত্র থাকতে পারে। কারণ, যুদ্ধের সময় নওয়াজিশ সাহেবের স্ত্রী তার সাথে ছিল। ১০ম রাইফেলস ব্যাটালিয়নের কাছে অনেক কাগজপত্র আছে। কারণ ১০ম রাইফেলস ব্যাটালিয়ন অত্র এলাকায় নেতৃত্ব দিয়েছে। বিডিআর লেফটেন্যান্ট (অব.) সোবহান এখনও জীবিত আছেন। তার বাড়ি মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায়।

সূত্র: জ-৯০৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. সিরাজুল ইসলাম (শিহাব)	**মো. আমির বক্স চৌধুরী (মুক্তিযোদ্ধা)**
দাশের হাট উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স : ৫০
নবম শ্রেণি, রোল : ১২	

মহিলাদের নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে গ্রামে আসে

আমি ১৯৭১ সালে বিএ পরীক্ষার্থী ছিলাম। আমি খুবই উদ্বিগ্ন ছিলাম এবং মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম কীভাবে দেশমাতৃকাকে শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারি। ২৭ মার্চ জানতে পারলাম যে, আমাদের একজন শিক্ষক যার নাম মো. বদরুজ্জামান তিনি সকল ছাত্র-জনতাকে ফুলবাড়ী থানায় আহ্বান করেছেন। উক্ত সংবাদ শুনে আমি তৎক্ষণাৎ থানার উদ্দেশে রওনা হলাম এবং দুপুর দুইটার সময় সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে আরও অনেক ছাত্র-যুবককে দেখতে পেলাম। স্যার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ডেকে ডেকে আমাদেরকে একটি ৩০৩ রাইফেল ও ৫০ রাউন্ড গুলি দিলেন। পরের দিন ২৮ মার্চ মোগলহাট হতে শুরু করে কুড়িগ্রামের পাটেশ্বরী ঘাট পর্যন্ত ধরলা নদীর এপারে ডিফেন্স তৈরি করা হলো। উক্ত ডিফেন্সসমূহ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হলো স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ওপর। সেই সময় তৎকালীন ইপিআরদের মাধ্যমে কীভাবে রাইফেল চালানো যায়, এর স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদেরকে বিভিন্ন ডিফেন্সে পাঠানো হলো। ১৫ জন ছাত্রের একটি দল গঠন করে উক্ত দলের সেকশন কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হলো আমাকে। আমি আমার দলসহ ধরলা নদীর এপারে ৫নং ডিফেন্সে অবস্থান গ্রহণ করলাম।

ভারতের কোচবিহর জেলার দিনহাটা মহকুমার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জে ইপিআর হেডকোয়ার্টার অস্থায়ীভাবে তৈরি হলো। সেখানকার কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ উদ্দীন। তার নেতৃত্বে ধরলা নদীর এপারের ডিফেন্সসমূহ পরিচালিত হয়েছিল। সম্ভবত ১৪ এপ্রিল পাক হানাদার বাহিনী পাটেশ্বরীঘাট পার হয়ে নাগেশ্বরীতে অবস্থান নেয়। ধরলা নদীর ডিফেন্সসমূহ উঠিয়ে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় নেওয়া হয়েছিল। আমি আমার দলসহ সাহেবগঞ্জ হেডকোয়ার্টার ফেরত গেলে পুনরায় আমাকে ভুরুঙ্গামারী পশ্চিম বাগভাণ্ডার বিওপির অপরদিকে বাতশমারী সীমান্তে পাকবাহিনীর বিপক্ষে ডিফেন্স নিতে হয়েছিল। সেখানে বেশ কিছুদিন থাকতে হয়েছিল। মে মাসের শেষ দিকে আবারও সাহেবগঞ্জ হেডকোয়ার্টারে আমাদেরকে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে ৫০ জন ছাত্রের একটি দলকে উচ্চতর গেরিলা প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের জলপাইগুড়ি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছিল। উক্ত ক্যাম্পের নামটি আমাদের কাছে মুজিব ক্যাম্প হিসেবে পরিচিত ছিল।

সম্ভবত ২৫ মে আমরা ওই ক্যাম্পে সকাল ৬টায় পৌঁছি। ভারতীয় কমান্ডারগণ আমাদের নিকট আসেন এবং সকলকে সারিতে দাঁড়াতে বলেন। সারিতে দাঁড়ালে তারা বিভিন্নভাবে আমাদের পরীক্ষা করে ৪০ জনকে প্রশিক্ষণ

দেয়ার জন্য অনুমোদন করেন। আমাদেরকে উক্ত ক্যাম্পে ভাসানী উইংয়ে থাকার জন্য ব্যবস্থা করে দেন। পরের দিন ভারতীয় প্রশিক্ষক নরেন্দ্রনাথের মাধ্যমে উক্ত দলের প্লাটুন কমান্ডার আমাকে নিযুক্ত করেন এবং প্রশিক্ষণের কার্য শুরু হয়। সেখানে একটি মাস সফলভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলাম। প্রশিক্ষণ শেষে আমার দলকে ভারতের গিতালদহ সাব-সেক্টরে ভারতীয় কমান্ডারের অধীনে পাঠায়। আমরা গিতালদহে এসে পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধ আরম্ভ করি। ভারতীয় ক্যাপ্টেন ছিলেন হিন্দি ভাষী। তার ভাষা ঠিক বুঝতে পারতাম না। তাই সেক্টর কমান্ডার খাদেমুল বাসারের নিকট সংবাদ প্রেরণ করা হলে তিনি অল্প দিনের মধ্যেই বাংলাভাষী ক্যাপ্টেন দেলোয়ারকে আমাদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। সম্ভবত জুলাই মাসের শেষের দিকে লালমনির রেললাইনের খোড়ারপুল অপারেশন করার জন্য যাই। সফলভাবে অপারেশন করে নিরাপদে ক্যাম্পে ফিরে আসি। পরবর্তী সময়ে সাব-সেক্টর গিতালদহ ও সাব-সেক্টর সাহেবগঞ্জ মিলিতভাবে মোগলহাট হতে পাটেশ্বরী হয়ে সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ডিফেন্স তৈরি করে মুক্তিযোদ্ধাদের উক্ত ডিফেন্সে প্রেরণ করা হয়। সেখান থেকে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেন।

মনে পড়ে ১৯৭১ সালের ১৬ অক্টোবর রাত্রে আমি ছয় জন সাথি নিয়ে কুড়িগ্রামের টগরাইহাট পাকবাহিনীর ক্যাম্পে অপারেশন করার জন্য যাচ্ছিলাম। চৌকাল ঘাটের দক্ষিণে একটি ফেরি ঘাটে উপস্থিত হলে ঘাটের অপর পাশে অনেক লোকের শোরগোল শুনতে পাই। দেখা যাচ্ছিল, একটি নৌকা অনেক লোকসহ ঘাটের দিকে আসছিল। আমি আমার সাথিদেরকে পজিশন নিয়ে থাকতে বললাম। কিছুক্ষণ পরে নৌকাটি ঘাটে ভেড়ার পরে হাত উঠিয়ে আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত দিল এবং নৌকা ঘাটে পৌঁছল। তখন দেখতে পেলাম হাত ও চোখ বাঁধা অবস্থায় খাকি পোশাক পরিহিত লোকটিকে নিয়ে লোকজন আমাদের দিকে আসছে। তারা এসে হাত-চোখ বাঁধা লোকটি আমার হাতে দিয়ে বলল, এটি পাকসেনা। মেয়েদের কাপড় পরিধান করে মহিলাদের ওপর নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে গ্রামে আসে। তখনই আমরা একে ধরে ফেলি। পাকসেনাটি নিজের অধীনে নিয়ে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সে তার নাম মকবুল হোসেন বলে এবং মাত্র ১৮ মাস প্রশিক্ষণ শেষে এখানে এসেছে বলে প্রকাশ করে। পরবর্তী সময় পাকসেনাটিকে ভারতের সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর নওয়াজেসের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল।

সম্ভবত, ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময় নাগেশ্বরী থানার পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বড়বাড়ী নামক স্থানে আমরা দলবলসহ পাকসেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। দীর্ঘ ৪-৫ ঘণ্টা ধরে গুলি বিনিময়ের পর তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল।

সূত্র: জ-৫৪৪৭

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. আজিজুর রহমান	**মো. সোবহান আলী মিঞা**
ফুলবাড়ী ডিগ্রি কলেজ	গ্রাম : গৌরক মণ্ডল, ডাক : নাওডাঙ্গা
বিএসএস, ৩য় পর্ব-১১	থানা : ফুলবাড়ী, জেলা : কুড়িগ্রাম

দুধ কুমার নদীর তীরে পাঁচ জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন

২৪ এপ্রিল ১৯৭১। সকল ১০টায় বদরুজ্জামানের ডাকে ছাত্র আন্দোলনের সূত্র ধরে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেই। বদরুজ্জামান তখন ঢাকা ভার্সিটির ছাত্র ছিলেন। ফুলবাড়ী থানার ১নং ইউপি বালারহাটে একটি জরুরি সভা করেন তিনি। সভায় সশস্ত্র সংগ্রাম করার আহ্বান জানান। আমরা কতিপয় ছাত্র-জনতা তার ডাকে সাড়া দিয়ে ফুলবাড়ী থানা থেকে ৩০৩ রাইফেল গ্রহণ করি। এক সপ্তাহ উক্ত রাইফেল চালনা করার ট্রেনিং নেই। পরে ধরলা নদীর পূর্ব তীরে ১২ মে থেকে বাংকার ডিফেন্সে অবস্থান নিয়ে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ১২টি বাংকারে ছাত্র-জনতা,

ইপিআর, পুলিশসহ মোট ৮৪ জন সংযুক্ত ছিলাম। এই ৮৪ জনের নেতৃত্বে ছিলেন বদরুজ্জামান ও সুবেদার বোরহান। তাদের নেতৃত্বে আমরা ৭টি সেকশনে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ করি।

৭ জুন ১৯৭১। ছয় জন পাকসেনা কদমতলা কুলাঘাটে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করলে মুক্তিযোদ্ধার গুলিতে নিহত হয়। এখানে লুৎফর রহমান নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন। তার মাজার ফুলবাড়ী থানা জামে মসজিদ সংলগ্ন। ১৫ জুন জানতে পারলাম পাটেশ্বরী হয়ে পাকসেনা ধরলা নদী পার হয়ে আন্দারীর ঝাড় নামক স্থানে গোলা বিনিময় করছে। কমান্ডারের হুকুমে ১৬ জুন ভোরে ধরলা নদীর তীর থেকে বাংকার বাতিল করে ভারতে কুরশাহাট ও শুকারোকুটি এলাকায় বালতোড়ী নামক বাংলার ছিটমহলে ক্যাম্প করি। সেখান থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত ফুলবাড়ী, গংগারহাট গাগলা ও কাশিপুর অনন্তপুর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করি ও মুক্ত রাখি।

বিশেষ কারণে সুবেদার বোরহানের আমন্ত্রণে ছাত্রদের একটি কোম্পানি গঠিত হয়। হাবিলদার শহিদ ফজলুল হক ও বদরুজ্জামানের নেতৃত্বে বাগভাণ্ডার ও দুধ কুমার নামক নদীর পশ্চিম প্রান্তে বাংকার করি। উক্ত বাগভাণ্ডার ইপিআর ক্যাম্পের পূর্ব পাশে ভুরুঙ্গামারী থানা থেকে আন্দারীর বাজার পর্যন্ত পাকসেনা অবস্থান করে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে গুলি বিনিময় চলতে থাকে। উক্ত যুদ্ধে পাকসেনার দুইটি ভ্যান ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও বহু পাকসেনা নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক কালাম এবং হাবিলদার ফজলুর হকসহ মোট পাঁচ জন শহিদ হন। তিনদিন পর জরুরি সংবাদে হায়ার ট্রেনিং নেয়ার জন্য ২১ জুলাই দিনহাটা হয়ে ভারতের নিউকুচবিহার রেলস্টেশনে যাই। সেখান থেকে লামডিং রেলস্টেশনে যাই। তারপর বাসযোগে আগরতলা পৌঁছি।

দুই দিন সেখানে অবস্থান করার পর ভারত-বাংলার নেতাদের সমন্বয়ে মেডিকেল পরীক্ষা শেষ করে ২৪ তারিখ সকালে বিমানযোগে বাংলার একশ জন ছাত্র তেজপুর, আসাম গিয়ে পৌঁছি। ভারতীয় আর্মিদের গাড়িতে করে ছলিনাবাড়ী নামক পাহাড়ি এলাকার সংরক্ষিত এক মাঠে উপস্থিত করা হয়। অতঃপর সেখানে ৪১ দিন ট্রেনিং সমাপ্ত করে একটি পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ হই। উক্ত সেন্টারে ৩৩ জন ইনস্ট্রাকটর পদে উন্নীত হয়ে বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেই।

১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দেই। ২১ দিন করে ট্রেনিং দিয়ে নিজ জেলার বেসিক ক্যাম্পের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলার মুক্তিযোদ্ধাদের ভেতরে পাঠাই। ১৫ ডিসেম্বর জরুরি সংবাদে কলকাতা হয়ে নিজ নিজ জেলার বেসিক ক্যাম্পে ফেরত আসি এবং ১৬ ডিসেম্বর জয়ের পতাকা নিয়ে মোগলহাট হয়ে লালমনিরহাট পৌঁছি। সেখানে ২৪ ঘণ্টা অবস্থান করার পর ১৮ ডিসেম্বর সাপটিবাড়ি, হারাগাছ হয়ে রংপুরে পৌঁছি। ১১ এবং ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ ক্যাপ্টেন দেলোয়ার, নওজেশ ও সেক্টর কমান্ডার খাদেমুল বাসারের আহবানে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে অস্ত্র জমা দেই।

সূত্র: জ-৫৪৫২

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. নাজমুল হুদা হিরা	**মো. শাজাহান আলী**
ফুলবাড়ী ডিগ্রী কলেজ	গ্রাম : কুরুষা ফেরুষা, ডাক : নাজদাঙ্গা
কারিগরি ২য় বর্ষ	থানা : ফুলবাড়ী, জেলা : কুড়িগ্রাম
ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম	

ছয় জন বাঙালি যুবতীকে বিবস্ত্র অবস্থায় উদ্ধার করা হয়

আমি কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলাধীন ধনীগাগলা গ্রামের বাসিন্দা। আমি আমার বাবার নিকট থেকে সাক্ষাৎকার নিয়েছি। বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হওয়ায় আমি খুবই গর্বিত ও আনন্দিত। আমার বাবার নাম মো. আবুল খালেক। আমার বাবা যখন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র ২১ বছর। যেদিন আমার

বাবা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন সে দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ২ মে। বাবা প্রথমে কাউকে না জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চলে যান।

প্রথমে তিনি ভারতের বামনহাট গিয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ভর্তি হন। সেখানে দুই দিন থাকার পর ভারতের দিনহাটায় যান। সেখানে কয়েক দিন থাকার পর তাকে কুচবিহার পাঠিয়ে দেয়া হয়। কুচবিহারে দুই দিন থাকার পর তাকে শিলিগুড়ি হয়ে জলপাইগুড়ি জেলার মুরতি ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে এক মাস প্রশিক্ষণ হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তার একটি নম্বর দেয়া হয় ৯২/১৬। ট্রেনিং শেষে বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার বড়খাতা নামক স্থানে প্রেরণ করা হয়। সেখানে এসেই শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে একজন সহযোদ্ধা হযরত আলী পাকবাহিনীর গুলিতে নিহত হন। বড়খাতায় এক মাস থাকার পর কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী থানায় আসেন। সেখানে সম্মুখ যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ শেষে ছয় জন পাকসেনাকে জীবিত অবস্থায় গ্রেফতার করা হয়। যুদ্ধবন্দিদের ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। যখন ছয় জন সেনাকে গ্রেফতার করা হয় ঠিক তখনই ছয় জন বাঙালি যুবতীকে বিবস্ত্র অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তাদের উদ্ধার করে বস্ত্র দিয়ে নিজ নিজ বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

রায়গঞ্জ নামক স্থানে একদিন রাত দুইটার সময় মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। শুরু হয় পাকবাহিনীর সাথে তুমুল গোলাগুলি। যে যুদ্ধে শহিদ হন যুদ্ধ অধিনায়ক লে. সামাদ। যুদ্ধ শেষে তার লাশটি উদ্ধার করে জয়মনিরহাট মসজিদের সামনে দাফন করা হয়। তার দাফন স্থানটি এখনও আমাদের চোখে পড়ে। তার দুই দিন পর নিলুরখামার নামক স্থানে তিন জন মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধরত অবস্থায় শহিদ হন। তারা হলেন, শহিদ আবুল হোসেন, শহিদ আলী হোসেন, শহিদ আবুল আজিজ। ওই তিন জন শাহাদত বরণকারীর লাশও লে. সামাদের কবরের পাশে দাফন করা হয়। আর এক দিন পরেই ছিল ঈদুল ফিতর। ঈদুল ফিতরের দিন ভোর চার ঘটিকায় রায়গঞ্জের উত্তর পশ্চিমে ফুলকুমার নদীর তীরে পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখযুদ্ধ হয়। ওই যুদ্ধ বেলা দশ ঘটিকা পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। সেই যুদ্ধে কয়েকজন পাকসেনা মারা যায় ও একজন রাজাকার আহত অবস্থায় গ্রেফতার হয়। গ্রেফতার করার সাথে সাথেই সে মারা যায়।

দেশ বিজয়ের ২২ দিন পর চর ভুরুঙ্গামারীতে কাশিয়ার ঝোপ থেকে এক জন পাকসেনা বের হয়ে পার্শ্ববর্তী এক বাড়িতে কিছু খাবার প্রার্থনা করে। তাকে বসতে দিয়েই বাড়িওয়ালা মুক্তিযোদ্ধাদের খবর দেয়। কয়েক মিনিট বিলম্ব হওয়ায় তার মনে সন্দেহ জাগে। সে তখন বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তায় ওঠে। পেছন থেকে মুক্তিযোদ্ধারা ধাওয়া করে তাকে। ধাওয়া খেয়ে সে নিজের আত্মরক্ষার জন্য গুলি করতে করতে জয়মনিরহাটের পূর্ব পার্শ্বে এক বাঁশ ঝাড়ে ঢোকে। তখন মুক্তিযোদ্ধারা তাকে ঘিরে ফেলে এবং তারা বলে, তুমি আত্মসমর্পণ কর, তোমাকে গুলি করা হবে না। তবু সে আত্মসমর্পণ করেনি। তখন তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়। তারপর সকল মুক্তিযোদ্ধা কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজে সমবেত হন।

সেক্টর নম্বর-৬, সেক্টর কমান্ডারের নাম খাদেমুল বাশার। সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর নওয়াজেশ উদ্দীন। এসব দিনের কথা মনে করলে আজও শরীর শিউরে ওঠে। আমরা শহিদদের আত্মত্যাগের কথা কখনও ভুলতে পারি না। তাদের আত্মা শান্তি পাক এই দোয়াই করি।

সূত্র: জ-১৩৪৬

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
হাসিনা আক্তার মালা	**মো. আবদুল খালেক**
জাগরণী বহুমুখী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ধনীগাগলা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
দশম শ্রেণি, রোল : ১০, মানবিক শাখা	বয়স : ৫৫

বিপুল বিক্রমে আক্রমণ শুরু করলাম

১৯৭১ সাল। আমি ছিলাম ২৫ বছরের যুবক। দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। স্বাধীনতা ঘোষণার পর আমি মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করি। মুক্তিবাহিনীর ব্যাটালিয়ান নিয়ে আমি নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রামের রায়গঞ্জ বর্ডারে উপস্থিত হই। এদিকে পাকবাহিনী নাগেশ্বরী হতে ভুরুঙ্গামারী পর্যন্ত ঝোপের দুই পার্শ্বে গুলি ছুড়তে ছুড়তে চলে যায় এবং পথেঘাটে যারা থাকে তাদের গুলি করে হত্যা করে। আমি আর আমার ব্যাটালিয়ান দুধকুমার নদীর পূর্ব পার্শ্বে দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকি এবং রাতের বেলায় নদী পার হয়ে ভুরুঙ্গামারী, জয়মনিরহাট, রায়গঞ্জ বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়াই। এদিকে পাকবাহিনী ভুরুঙ্গামারী, জয়মনিরহাট, রায়গঞ্জের সব বাড়িঘর পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। এই দৃশ্য দেখে আমরা ভারতে চলে যাই এবং সেখানে গিয়ে আমার উপরস্থ কর্মকর্তাকে সব জানাই। তারপর সেখানে কিছু দিন আমরা প্রশিক্ষণ নিই। তারপর সেখান থেকে ফিরে আমরা ভুরুঙ্গামারীর উত্তরে কাদের ব্যাপারীর বাড়িতে আশ্রয় নিই এবং সেখানে থেকে সংগ্রাম শুরু করি।

এদিকে পাকবাহিনীর ক্যাপ্টেন আতাউল্লাহ খান ভুরুঙ্গামারীতে এসে আক্রমণ শুরু করল। সে ছিলেন খুবই দুর্ধর্ষ। মুক্তিবাহিনীর গুলির শব্দ শোনামাত্র সে তার ফোর্স ছাড়াই কেবল বডিগার্ড নিয়ে সেখানে উপস্থিত হত এবং মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। একদিন পাকবাহিনীর ক্যাপ্টেন আতাউল্লাহ খানের দল প্রতিহত করার জন্য আমাদের দিকে আসতে লাগল। তখন আমরা তাদেরকে বিপুল বিক্রমে আক্রমণ শুরু করলাম এবং আমাদের কোনো এক মুক্তিবাহিনীর গুলিতে সে মারা গেল। এই ভয়ে পাকবাহিনী ভুরুঙ্গামারী থেকে নাগেশ্বরী হটে গেল। এভাবে আমরা স্বাধীন করি ভুরুঙ্গামারী।

এরপর একদিন স্থানীয় এক লোক গোপনে আমাদের সংবাদ দেয় যে, জয়মনিরহাট থেকে কিছু দূরে এক বাঁশঝাড়ে পাকবাহিনীর গুলির শব্দ শোনা গেছে। তখন আমি কয়েকজন মুক্তিবাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হই। আমরা সবাই মিলে বাঁশঝাড় ঘেরাও করি। তারপর আমরা আস্তে আস্তে এগোতে থাকি কিন্তু কোনো পাকবাহিনীকে দেখতে পেলাম না। যেতে যেতে হঠাৎ একটা গর্ত আমার চোখে পড়ে। আমরা সবাই মিলে সেখানে ঘেরাও করি। কিন্তু কোনো মুক্তিবাহিনী সেখানে যেতে রাজি হলো না। তখন আমি এক হাতে রাইফেল নিয়ে বললাম, আমার জীবন যায় যাবে তবু পাকবাহিনীকে খতম করে ছাড়ব। এই বলে আমি গর্তের ভেতর গুলি ছুড়তে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর গর্তের ভেতর গিয়ে দেখি পাকসেনা মরে পড়ে আছে। তার গলায় একটি স্বর্ণের চেন ছিল। আমি সেটা নিয়ে গলায় পরি। তখন অনেক লোক সেখানে ভিড় জমায় এবং তারা সবাই আমাকে বাহবা দিতে থাকে। এই সংবাদ মুক্তিবাহিনীর মেজর নওয়াজেশের কানে গেলে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানান। আমি সেই স্বর্ণের চেনটি তাঁর গলায় পরিয়ে দিই।

তারপর আমরা পাকবাহিনীর পেছনে ধাওয়া করে নাগেশ্বরী আক্রমণ করলাম। তখন তারা বাধ্য হয়ে কুড়িগ্রামে চলে যায়। এইভাবে আমরা ভুরুঙ্গামারী, জয়মনিরহাট, রায়গঞ্জ, নাগেশ্বরীর বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে নিলাম। এরপর তারা কুড়িগ্রাম ছেড়ে ঢাকায় আসে। এদিকে সকল মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশের চতুর্দিকে ঘেরাও করে। কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে পাকবাহিনী তখন বাধ্য হয়ে মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করল। এইভাবে বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় লাভ করে।

সূত্র: জ-১০৯২

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
নুরুন্নাহার খাতুন	**মো. উমর আলী মিয়া**
নাগেশ্বরী ডিগ্রি কলেজ	গ্রাম : কদমতলা, থানা ও জেলা : কুড়িগ্রাম
বিএসএস-১ম বর্ষ, রোল : ০৫	বয়স: ৬৪, সম্পর্ক : জেঠা

বাবার হাতে গুলি লাগে

আমি কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী থানার অন্তর্গত নেওয়াশী গ্রামের অধিবাসী। আমার বাবার নাম মো. হাফেজ মোল্লা। আমি লাকি পারভীন খুশি। বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তিনি খুবই পরিশ্রমী ও সাহসী। ১৯৭১ সালে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তিনি এখনও বেঁচে আছেন। আমি বাবার মুখ থেকে একাত্তরের অনেক ঘটনাই শুনেছি।

বাবা ভারতের নেংটিসিংহের বাজারের নিকটবর্তী মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এক মাস গেরিলা প্রশিক্ষণের পর উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্য শিলিগুড়ি পানিগোটা মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যান এবং এক মাস প্রশিক্ষণ শেষে এফ এফ নম্বর ৪৪১১ অর্জন করেন। তার পর নিয়মিত ফোর্স হিসেবে আরো এক মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তারপর পাঁচশ মুক্তিযোদ্ধা আলফা কোম্পানি নাম ধারণ করে নাগেশ্বরী থানার উত্তরে ভারত-বাংলাদেশ বর্ডার সাহেবগঞ্জে নিজস্ব ক্যাম্প স্থাপন করেন এবং সেখান থেকে মুখোমুখি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেন। শুরু হলো যুদ্ধ। বাবার কাছ থেকে শুনেছি, দিনের বেলায় তিনি সাধারণ মানুষ হিসেবে শত্রুপক্ষের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন এবং রাতে গিয়ে অপারেশন চালান। এভাবে একটানা যুদ্ধে শত্রুপক্ষের অনেক ক্যাম্প দখল করে নেন। এভাবে পেয়েছেন অনেক গোলা বারুদ আর হাতিয়ার।

কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে, বাবা মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট হারিয়ে ফেলেছেন। যুদ্ধে বাবার বাম হাতে একটি গুলি লেগেছিল। তারপরও শত দুঃখের মাঝে সুখের কথা হলো উনি দেশ স্বাধীন করে এখনও বেঁচে আছেন। এটাই করুণাময়ের নিকট বড় পাওয়া।

সূত্রঃ জ-৫৪৪২

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
লাকি পারভীন খুশি	**হাফেজ মোল্লা (মুক্তিযোদ্ধা)**
নেওয়াশী জাগরণী বালিকা বিদ্যাবীথি	গ্রাম : নেওয়াশী, উপজেলা : নাগেশ্বরী
দশম শ্রেণি, মানবিক শাখা	জেলা : কুড়িগ্রাম, বয়স : ৯০

আমাকে মাটিতে ফেলে পশুর মতো অত্যাচার করে

আলেয়া বেগম। বয়স প্রায় ৮৫ বছর। বাড়ি রাজিবপুর। তিনি আমাদের গ্রামে আত্মীয় বাড়িতে বেড়াতে আসেন। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, পাকবাহিনী সোনাগাজী ও মতিনগঞ্জে শিবির স্থাপন করে স্থানীয় দালাল ও রাজাকারদের সহায়তায় শিবিরের আশপাশের গ্রামগুলো আক্রমণ করত। হঠাৎ গ্রামে প্রবেশ করে ধনরত্ন লুণ্ঠন করত এবং অসহায় নারীদের ওপর চালাত নির্মম অত্যাচার। পাকবাহিনীর অত্যাচারের ভয়ে উক্ত এলাকার প্রায় সকল যুবক-যুবতী বাড়ি ছেড়ে ভারতে এবং দূর গ্রামের আত্মীয় পরিজনের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

১৯৭১ সালের জুন মাসে পাকবাহিনী সোনাগাজী দখল করলে আমি আমার স্বামীর বাড়ি ত্যাগ করে সুদূর পলী-গ্রামে পালিয়ে ছিলাম। আগস্ট মাসে আমি সন্তান প্রসব করি। সন্তান প্রসবের দুই মাস পর শরীর অসুস্থ থাকায় পিতার বাড়ি হতে স্বামীর বাড়ি বাঘেরিয়ায় আশ্রয় নিই। তখন আমার স্বাস্থ্য অত্যন্ত দুর্বল ছিল। আমি তখন নিয়মিত ডাক্তারের ওষুধ ব্যবহার করতাম। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে পাকবাহিনী, দালাল, রাজাকার, আলবদর ও আলশামসের অত্যাচার বৃদ্ধি পায়। পাকবাহিনী গ্রামে প্রবেশ করার সংবাদ পেলে গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে আত্মগোপন করতাম। নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখে পাকবাহিনী ও মিলিশিয়া আমার স্বামীর বাড়ি আক্রমণ করে।

পাকবাহিনী আমাকে ধরে ফেলে এবং আমার কোল হতে আমার নবজাত সন্তানকে মাটিতে ফেলে দিয়ে সেখানেই পশুর মতো অত্যাচার করে। তাদের অত্যাচারে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। আনুমানিক ৪-৫ জন নরপশু আমার অসুস্থ দেহের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে আমাকে জ্ঞানহীন অবস্থায় ফেলে যায়। পরে আমার স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন স্থানীয় ডাক্তারের সহায়তায় আমার জ্ঞান ফিরিয়ে আনে। সেই অত্যাচারের স্মৃতি বহন করে আজও আমি অসহায় অবস্থায় বেঁচে আছি।

সূত্র: জ-৫২৬৮

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
সৌরভ কুমার বর্মণ	**আলেয়া বেগম**
বামনাছড়া নিু মাধ্যমিক বিদ্যালয়	গ্রাম : বাঘেরিয়া, থানা : রাজিবপুর
অষ্টম শ্রেণি	জেলা : কুড়িগ্রাম, বয়স : ৮৫

সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে

ডা. আব্দুল লতিফ পেশায় চিকিৎসক। বাড়ি রৌমারী। তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েও বেঁচে আছেন। তিনি বলেন, ৩১ আগস্ট মঙ্গলবার সকাল ৯টায় আনুমানিক ১৫ জন পাকসেনা ও সমপরিমাণ রাজাকার ঝোপডাঙ্গা বাজারে আসে। এর পূর্বে এই বাজারে পাকসৈন্য আসেনি। রাজাকার কমান্ডার স্কুলের শিক্ষক, পোস্ট অফিসের কর্মরত লোকজন সকলকে ঝোপডাঙ্গা হাইস্কুলে যাওয়ার জন্য আদেশ দেয়। সেখানে শান্তিবাহিনী গঠন করা হবে। নিরীহ জনগণ ভয়ে উপস্থিত হলো। কয়েক মিনিট আলাপ আলোচনার পর পাকবাহিনী ঝোপডাঙ্গার লোকদেরকে এক দিকে সরালো। আমি ওই জায়গায় প্রায় সাত বছর যাবত ডাক্তারি করছি। সরকারি কর্মচারীসহ আমাদের বহিরাগত ২৬ জনকে উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের অফিসে নিয়ে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে। আমাদেরকে পার্শ্ববর্তী থানা রৌমারী নিয়ে ছেড়ে দিবে বলে ঘর হতে বের করে নৌকায় নিয়ে যায়। অপরদিকে ঝোপডাঙ্গা গ্রাম ও বাজারের ৩৭ জনকেও বেঁধে অপর গ্রামের দিকে নিয়ে যায়। আমাদের ২৬ জনকে নৌকাযোগে চরগামী গ্রামে নিয়ে যায় তারা। সেখানে আমাদেরকে পুকুরের পাড়ে কিছু পানির মধ্যে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করায়। ওই সময় আমাদের হাত পেছনের দিকে শক্তভাবে বাঁধা ছিল। দুই দিক হতে পাকবাহিনী ও রাজাকার গুলি করতে থাকে। আমি হাতে-পায়ে গুলিবিদ্ধ হওয়ায় পুকুরের পানিতে ডুব দিই। বহু কষ্টে পুকুরের অপর পারে গাছের আড়ালে আশ্রয় নিই। কিছুক্ষণ সেখানে থাকার পর আবার পুকুরের আগের পারে গুলিবিদ্ধ শহিদ লোকদের পাশে আসি। সেখানে প্রত্যেককে ভালোভাবে লক্ষ করে দেখি সকলেই গুলিতে শাহাদতবরণ করেছে। অপরদিকে ঝোপডাঙ্গা এলাকার ৩৭ জনকে মাঠে নিয়ে অনুরূপ অবস্থায় গুলি করে হত্যা করে। আমি আহত অবস্থায় অপর গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিই। কয়েকজন শহিদের নাম নিম্নে দেওয়া হলো: আবদুল বারি মেম্বার, আ. লতিফ, সুন্দর মিয়া, তহশিলদারের দুই ছেলে, পোস্টমাস্টার, ঝোপডাঙ্গা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক মোকছেদ আলি ও অন্যরা। ৩১ আগস্ট পাকবাহিনী ও তার অনুচররা ৩৬ জন নিরীহ লোককে হত্যা করে ক্ষান্ত হয়নি।

সূত্র: জ-৫২৭২

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
ছায়া রানী	**আ. লতিফ**
বামনাছড়া নিু মাধ্যমিক বিদ্যালয়	গ্রাম : ঝোপডাঙ্গা, থানা : রৌমারী
অষ্টম শ্রেণি	জেলা : কুড়িগ্রাম, বয়স : ৫৬

শোঁ শোঁ শব্দে গুলি চলে গেল

আমি বিষুরাম মহন্ত। ১৯৭১ সালে আমার বয়স আনুমানিক ২৪-২৫ বছর। তখন মুদির দোকান করতাম। তারিখটা মনে নেই কিন্তু বারটা মনে আছে বৃহস্পতিবার, আমাদের উলিপুরের হাটের দিন। আমার মুদির দোকানের মালামাল নিয়ে সকালে হাটে যাচ্ছিলাম। পথের মধ্যে অনেকে বললেন যে, আজ ভীষণ গণ্ডগোল শোনা যাচ্ছে, হাটে যাওয়ার দরকার নেই।

আমি সাহস করে হাটের দিকে চললাম। হাটের মধ্যে দেখি লোকজন খুব কম। আমি আমার দোকানের মালামাল ঠিক করে দোকানে ছিলাম। হাটের মধ্যে সেদিন খুব দাবড়া-দাবড়ি হয়েছে।

একটু পরেই দেখি হাটের মধ্যে লোকজন প্রায় নেই। সব দোকানপাট লুট হয়ে গেছে। পাকবাহিনীকে মুক্তিবাহিনী খুঁজছে। আমি দোকান তুলছিলাম, এমন সময় পাকবাহিনী আমার দোকানের সামনে এসে আমাকে মারতে শুরু করল। আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। আমার ওপর যে কত লোক গিয়ে পড়ে তার ইয়ত্তা নেই।

যখন হুঁশ ফিরে পেলাম তখন দেখি প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমার দোকানের কোনো চিহ্ন নেই। আমি অসুস্থ অবস্থায় খুব ধীরে ধীরে বাজারের মধ্য দিয়ে যখন থানার মোড়ে এলাম, হঠাৎ উলিপুর ডাকবাংলোর দিক থেকে এলোপাথাড়ি গুলি আসতে লাগল এবং আমার কানের পাশ দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দে দুটি গুলি চলে গেল। একটু এদিক-ওদিক হলেই আমার মাথার খুলি উড়ে যেত। ভাগ্য ভালো ছিল বলে বেঁচে গেছি এবং আজও বেঁচে আছি।

সূত্রঃ জ-৫২৭৩

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
বিপুল কুমার মহন্ত	**বিষুরাম মহন্ত**
বামনাছড়া নিু মাধ্যমিক বিদ্যালয়	গ্রাম : বামনাছড়া
অষ্টম শ্রেণি	থানা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম
	বয়স : ৬০

আমরা কান্তর জন্য কিছুই করতে পারিনি

প্রথমে ঠিক করতে পারছিলাম না যে কার কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের করুণ কাহিনী শুনব, কারণ আমার দাদা-দাদি কেউ বেঁচে নেই। তারপর হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল আমাদের গ্রামের 'জদু' কাকার কথা। বিকেলের দিকে আমি তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখি তিনি একটি আমগাছের নিচে টংয়ের ওপর বসে আছেন। আমি তার কাছে যেতেই বললেন, বসো। আমি বসার পর আস্তে করে বললাম, আচ্ছা কাকা তুমি মুক্তিযুদ্ধ দেখেছিলে? তিনি এই কথা শুনে বললেন, এই সময় থাক ওই সব কথা। প্রথমে তিনি বলতে চাইছিলেন না। অনেক জেদের পর তিনি বললেন–

সেই দিনটি ছিল ১২ এপ্রিল ১৯৭১, শুক্রবার। এর আগে শুধু শুনেছিলাম পাকবাহিনীর সাথে আমাদের যুদ্ধ লেগেছে। আমাদের বাড়িটা ছিল রাস্তার ধারে। কিন্তু সেদিন সন্ধের পর হঠাৎ দেখি মানুষ চিৎকার করে দৌড়ে পালাচ্ছে। আমি তখনি বুঝলাম যে পাকসেনারা আমাদের গ্রামে এসেছে। আমি দৌড়ে এসে তোর কাকিকে বললাম, মিলিটারি গ্রামে এসেছে তাড়াতাড়ি পালাও। আমরা পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে একটি ডোবায় নেমে গেলাম। এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না, কারণ পাকবাহিনী আমাদের চারদিকে ঘিরে ফেলেছিল। ডোবাটি কচুরিপানা দিয়ে ভর্তি ছিল। সঙ্গে ছিল তোর কাকি ও আমার ছেলে কান্ত। আমরা তখন এক গলা পানিতে। চারদিকে বন্দুকের গুলির আওয়াজ। আগুন চারদিকে দাউ দাউ করে জ্বলছে। পুকুর থেকে শুনতে পেলাম একটি মেয়ের আওয়াজ। কী যে করুণ তা না শুনলে কখনো বোঝানো যায় না। চারদিকে খইয়ের মতো বুলেট ফুটছে। ভয়ে আমরা তখন কাঁপছিলাম। একটি গুলি আমার মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়। তখন আমাদের প্রাণ নিজের হাতে। এমনি করে অনেকক্ষণ চলতে লাগল। হঠাৎ করে একটি গুলি আমার ছেলে কান্তের বুকের মধ্যে লেগে যায়। সে বাবা বলে চিৎকার করে ওঠে। আমি এবং তোর কাকি কান্তকে জড়িয়ে ধরলাম। রক্তে পুকুরের পানি লাল হয়ে গেল। কান্তকে আমরা শুকনো জায়গায় তুলতে পারছিলাম না কারণ তখনো পাকসেনারা গুলিবর্ষণ করছিল। প্রায় ৩-৪ ঘণ্টা পর তারা চলে যায়। এই দীর্ঘ সময় আমরা কান্তর জন্য কিছুই করতে পারিনি। শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছি। তারপর তাকে শুকনো জায়গায় নিয়ে এলে ৫-১০ মিনিট থাকার পর তার পরান পাখি উড়ে যায়। তোর কাকি চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠল। আমি তার মুখ চেপে ধরলাম, চিৎকার করো না, তাহলে আমাদেরকেও মারা পড়তে হবে। তখন তোর কাকি বলে বেঁচে থেকে আর কী লাভ!

কয়েক মাস পর দেশ স্বাধীন হলো। তোর কাকি তার ছেলে কান্তর শোকে মারা গেল। এখন আমি আমার ছেলে, স্ত্রী হারিয়ে একা বেঁচে আছি। আমার এই একাকিত্বের জন্য কে দায়ী বলতে পারিস? এর জন্য দায়ী ওই নরপিশাচরা, মানুষরূপী ওই জানোয়াররা। শুধু আমার জীবন নয়, এমনি করে আরো কত ভাই-বোনের জীবন নষ্ট করেছে তারা। কিন্তু এখন আমরা শত্রুমুক্ত, আমরা স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক। পূর্বে আমাদের দেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান কিন্তু এখন এর নাম হচ্ছে বাংলাদেশ।

সূত্র: জ-১০৭৩

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
শফিউল মুয নাবিন	**জদু কাকা**
রাজারহাট পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	
দশম শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ	

শ্রদ্ধাভরে তাকিয়ে থাকেন নামফলকটির দিকে

কুড়িগ্রাম নাগেশ্বরী সড়কে চণ্ডিপুর এবং দক্ষিণ ব্যাপারীরহাটের মধ্যবর্তী স্থানে ঠিক সড়কের পার্শ্বে একটা স্মৃতিসৌধ আছে। স্বল্প খরচে নির্মিত এই সৌধটি ১৭ জন শহিদ মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতি বহন করছে। প্রতিবছর ২৬ মার্চ এবং ১৬ ডিসেম্বর সেখানে ফুল দেয়া হয়। ওই সকল মহান শহিদের আত্মার মঙ্গলের জন্য আল্লাহতালার কাছে মাগফেরাত কামনা করা হয়। স্বভাবতই জানতে ইচ্ছে করে, কেমন করে কীভাবে অতোগুলো লোক শহিদ হলেন?

স্থানীয় মুরব্বিদের মুখে শোনা গেল, কুড়িগ্রাম শহরের পূর্ব পার্শ্বে ধরলা নদীর উত্তর পাড়ে মুক্তিযোদ্ধারা একটা বড় ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পাকবাহিনী তিস্তা নদীর প্রতিরোধ ভেঙে দিয়ে কুড়িগ্রাম শহর পর্যন্ত আসে। তখন ধরলা নদীর ওপর ব্রিজ ছিল না। রংপুর অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন বিভিন্ন জায়গায়। যতদিন পারেন পাকবাহিনীকে বাধা দেন। প্রাথমিক অবস্থায় বহু পাকসেনাকে পরাজিত করেন। কিছুদিন পরে পাকসেনারা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদসহ প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উপস্থিত হয়। আধুনিক ভারী অস্ত্রের কাছে টিকতে না পেরে মুক্তিযোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হতে বাধ্য হন। পুনরায় একত্রিত হয়ে নতুন করে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তেমনি একটা প্রতিরোধ ছিল ধরলা নদীর উত্তর পার্শ্বে। ওপার হতে পিছিয়ে আসা মুক্তিযোদ্ধা এবং উত্তর ধরলার নাগেশ্বরী ভুরুঙ্গামারী এলাকার সকল জনগণ, ইপিআর, আনসার, পুলিশ সকলে মিলে ধরলার উত্তর পাড়ে পাকবাহিনীকে বাধা দেওয়ার জন্য একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। নাগেশ্বরী এলাকার সাধারণ মানুষ তাদের জন্য খাবার এবং অন্যান্য রসদ সরবরাহ করেন। এমনি অবস্থা কিছুদিন চলতে থাকে। হঠাৎ একদিন কুড়িগ্রাম থেকে পাকসেনার দল আধুনিক অস্ত্র নিয়ে ধরলার প্রতিরোধ ভাঙে এবং নাগেশ্বরীতে অবস্থিত অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করার একটা পরিকল্পনা আঁটে। তারা পাটেশ্বরী এলাকার এক লোক দ্বারা খবর পাঠায় যে মুক্তিযোদ্ধারা এখনও ধরলার ব্যারিকেড ধরে আছে তাদের জন্য খাদ্য ও গুলির বাক্স দরকার। এ কথা শোনামাত্র নাগেশ্বরী এলাকায় অবস্থিত সংগ্রাম কমিটির লোকজন তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে এবং খাদ্যসহ কয়েকজন ইপিআর সদস্যকে ট্রাকে করে কুড়িগ্রাম ধরলার পাড়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

কিছুসংখ্যক উদ্যোগী যুবক ওই ট্রাকে করে প্রতিরোধ দেখতে প্রয়োজনে যুদ্ধ করার জন্য তাদের সাথে সাথে যায়। চতুর, ধুরন্ধর পাকবাহিনীর কৌশল বুঝতে না পেরে সেদিন প্রাণ দিতে হয় ইপিআর জোয়ানসহ আরও কয়েকজন তরতাজা তরুণকে। তাদের সাথে দুজন ড্রাইভারও ছিলেন।

নাগেশ্বরী থেকে যখন ট্রাকটি রওনা হয় তখন উৎসাহী, সংগ্রামী মানুষগুলো ট্রাকে ওঠার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে। যিনি যেতে না পেরে আফসোস করলেন তিনিই বেঁচে গেলেন। আর যিনি বা যারা ট্রাকে স্থান করে নিতে পেরে খুশি হয়েছিলেন তারাই দক্ষিণ ব্যাপারীর হাট পার হয়ে চণ্ডিপুরের কাছাকাছি কদমতলা নামক স্থানে

পাকসেনাদের পাতানো ফাঁদে পড়ে গেলেন। পাতানো মাইন বিস্ফোরিত হলো। গগনবিদারী শব্দে চারদিক প্রকম্পিত হলো। আশপাশে অ্যাম্বুশে পজিশনে থাকা পাকসেনারা গুলি করে আহত মুক্তিসেনার দলটিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিল।

খানসেনারা চলে গেলে স্থানীয় গ্রামবাসী লাশগুলোকে গর্ত করে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। থানা প্রশাসন থেকে বহুদিন পরে সেখানে গণকবরটির উপরে লোহার ঘের দিয়ে ছোট একটা স্মৃতিফলক তৈরি করেছে। যাদের পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে শ্বেতপাথরে তাদের নাম লেখা আছে।

নামগুলো হলো : ১. শহিদ মো. আবদুল ওহাব ২. শহিদ মো. রইচ উদ্দিন ৩. শহিদ মো. আসাদ আলী ৪. শহিদ মো. আব্দুল জব্বার ৫. শহিদ মো. আবুল (ড্রাইভার) ৬. শহিদ মো. গোলাম রাব্বানী ৭. শহিদ মো. আবুল কালাম আজাদ (ইপিআর) ৮. শহিদ মো. সেকেন্দার আলী ৯. শহিদ মো. আফজাল হোসেন (ড্রাইভার) ১০. শহিদ মো. আবুল কাসেম (ইপিআর) ১১. শহিদ মো. খয়বর আলী ১২. শহিদ মো. আব্দুল আলী ১৩. শহিদ মো. এম আবুল কাসেম ১৪. শহিদ মো. আনছার আলী ১৫. শহিদ মো. দেলোয়ার হোসেন ১৬. শহিদ মো. আতিকুর রহমান এবং ১৭. শহিদ মো. মোজাম্মেল হক

যে কোনো পথিক হেঁটে যাওয়ার পথে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধাভরে তাকিয়ে থাকেন নামফলকটির দিকে। বাসযাত্রীরা পশ্চিম দিকে তাকালে ওই স্মৃতিসৌধটি দেখতে পায়। মুক্তিযুদ্ধ যারা দেখেছেন এবং বেঁচে আছেন, ওই স্থানে গেলে তাদের তখনকার স্মৃতি মনের পাতায় ভেসে ওঠে।

সূত্র: জ-১১৬৮

সংগ্রহকারী
নাজমুন নাহার
ভিতরবন্দ স্নাতক মহাবিদ্যালয়
একাদশ শ্রেণি

বর্ণনাকারী
চণ্ডীপুরবাসী

স্কুল ঘরমে কুই আদমী নেহি হ্যায়

১৯৭১ সালের ১০ জুন। বর্ণনাকারীর জীবনে একটা স্মরণীয় দিন। রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলার একটা সত্য কাহিনী। খানসেনাদের ভয়ে সকলেই ছিল ভীতসন্ত্রস্ত। কখন পাকবাহিনী যমের মতো বীভৎস চেহারায় হাজির হবে। এমনটা ভাবার স্বাভাবিক কারণ– আগের দিন বিকাল বেলায় একজন পাকআর্মির অফিসারসহ মোট দুইজন সৈন্যকে সাধারণ মানুষ লাঠিসোঁটা, বলম, দা-কুড়াল দিয়ে হত্যা করেছে। ওই দিন থেকে পাকআর্মির অপারেশন শুরু হয়েছিল। যাকে সামনে পেয়েছে তাকেই গুলি করে হত্যা করেছে। যেখানে মানুষ পায়নি সেখানকার বাড়িঘর পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। পরে তারা আরও উগ্রমূর্তি নিয়ে আসবে এ কথা কাউনিয়া থানার বাঙালি পুলিশ কর্মকর্তারাই গোপনে কাউনিয়া থানা সদরের মানুষের মাঝে প্রচার করেছিল। ফলে যে যেখানে পারে আশ্রয় নিয়েছে। কেউ রাতারাতি অনেক দূরে পালিয়ে গিয়েছিল। বর্ণনাকারী স্কুলঘরে তার বাড়ির দামি জিনিসপত্র লুকিয়ে রাখতে সারারাত পার করে দিয়েছিলেন। তাই পালাতে পারেননি। স্কুলঘরে মালামাল রাখার কারণ, হয়তো সরকারি সম্পত্তি পাকসেনারা পোড়াবে না। প্রতিদিন সকালে স্কুলের দফতরি পাকিস্তানি পতাকা উড়িয়ে দিয়ে যায় আর পাকসেনারা পাকিস্তানি সম্পদ মনে করে আগুন লাগায় না। তাই মালামালের সাথে বর্ণনাকারী নিজে, তাঁর বাবা ও দূর সম্পর্কের এক চাচাসহ কাউনিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের একটি কক্ষে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

যথারীতি পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটা বিরাট দল রেলগাড়িতে করে স্কুলের পাশে এসে নামল। বর্ণনাকারী গুনলেন সর্বমোট ৯০ জন। অন্যদিকে বা অন্যস্থানে আরও থাকতে পারে। তারা নেমেই ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সারা এলাকা টহল দেয়া শুরু করল। একটি দল স্কুলের বারান্দা ধরে হাঁটতে শুরু করে। তারা প্রতিটি দরজা

ধাক্কা দিয়ে দেখে। আশ্রয় নেওয়া কক্ষটি ভেতর থেকে বন্ধ থাকলেও বাইরের দিকে দরজায় তালা লাগানো ছিল। বর্ণনাকারী দুরু দুরু বক্ষে মৃত্যুর অপেক্ষা করছিল। আশপাশ থেকে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। পাকসেনাদের বুট জুতোর কচকচানিতে ভয় যেন আরও বেড়ে যায়। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল তিন তিনটে মানুষকে পাকসেনারা ধরে নিয়ে এলো। বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে বর্ণনাকারী দেখছেন লোকগুলোকে রেললাইনের পাশে দাঁড় করিয়ে পাকসেনারা রাইফেল উঁচু করছে। তিনি স্পষ্টই দেখতে পেলেন সামনের লোকটি বর্ণনাকারীরই ফুপাতো বোনের স্বামী মজিবর। ঠাস ঠাস গুলির শব্দ হলো। আল্লাহ বলে ভগ্নপতি মজিবর আকাশে লাফিয়ে উঠল। উল্লেখ্য, সেদিন একইভাবে অনেক নিরীহ, নিরস্ত্র কাউনিয়াবাসীকে হত্যা করা হয়।

ঠিক তেমনি মুহূর্তে অন্য একটি দল স্কুল ঘরের পেছনে এসে সন্দেহের চোখে এদিক-ওদিক দেখছে। পাশেই ছিল প্রধান শিক্ষকের কোয়ার্টার। সেখানে দুটো অংশ। তার এক অংশে ছিল এক বিহারি পুলিশ। তাকেই খানসেনারা বাড়ির ভেতর থেকে বের করে এনে জিজ্ঞাসা করল, 'স্কুল ঘর মে কুই আদমী হায়? কথাগুলো বর্ণনাকারী স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। বিহারি পুলিশ সিপাই লোকটা জানত যে, বর্ণনাকারীসহ মোট তিনজন লোক স্কুলঘরের একটা কক্ষে লুকিয়ে আছে। তখন যে কী অবস্থা তা আক্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারবে না। তখন বর্ণনাকারীর মনে হতে লাগল এই বুঝি বিহারি চাচা বলবে, 'হ্যাঁ ঘরমে তিন বাঙালি হায়।' আর বর্ণনাকারী একটু আগের দেখা ঘটনার মতো আরও একটি ঘটনা ভাবতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বর্ণনাকারীর ভবলীলা সাঙ্গ হচ্ছে। তিনিও আকাশে লাফিয়ে ধপাস করে পড়ে যাবেন আর স্কুলের বারান্দায় রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু না বিহারি পুলিশ লোকটি বললো, 'না, স্কুল ঘরমে কুই আদমী নেহি হ্যায়' তখন হানাদার দল ধমকের সুরে বলল, 'ফ্লাগ কৌন উড়া দিয়া?' 'দফতরী উড়া দেকে ভাগগিয়া।' পুলিশ লোকটি বলল।

দুটো কথাতেই বর্ণনাকারীসহ তিনটি লোক বেঁচে গেলেন। বর্ণনাকারী লেখাপড়া শেষ করে শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করলেন। তিনি আমাদের অধ্যক্ষ স্যার। তাঁর নিকট থেকে এই কাহিনী শুনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে লিখে পাঠালাম।

সূত্র: জ-১১৬৯

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
রুমানা সরকার	**মো. জয়নুল হোসেন সরকার**
ভিতরবন্দ ডিগ্রি কলেজ	অধ্যক্ষ, ভিতরবন্দ ডিগ্রি কলেজ
দ্বাদশ শ্রেণি	নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম

বাবা ফিরে এলেন না

১৯৭১-এর কথা মনে হলে আজও আমার মন ভয়ে থর থর করে ওঠে। কী ভয়াবহ দৃশ্য ছিল সেই দিন আমি তা আজও ভাবি। আমার বয়স তখন ছিল প্রায় ১৭ বছর। সেই দিনের কথা আমার খুব ভালোভাবেই মনে আছে।

যুদ্ধ শুরুর কোনো একদিনের কথা। সেদিন আমাদের গ্রামে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী এসেছিল। পরে তারা আরও অনেক দিন এসেছিল। কিন্তু সেই দিন ঘটেছিল আমার জীবনের এক মর্মান্তিক ঘটনা। আমরা বাড়িতে ছিলাম মা-বাবা আর চার ভাইবোন। আমি ছিলাম সবার বড়। আমি তখন দশম শ্রেণিতে পড়ি। আমার মা-বাবা আমাদেরকে খুবই স্নেহ করতেন। বাবা ছিলেন চাকরিজীবী। তিনি দাখিল মাদ্রাসার একজন শিক্ষক। আমার বাবা বাজার থেকে শুনে এসে আমার মাকে বললেন যে, গ্রামে মিলিটারি এসেছে। আমরা সবাই ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। তারপর গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। গ্রামের লোকজন সবাই ছোটাছুটি করতে লাগল। আমার বাবা আমার চার ভাই বোনকে ভয় করতে মানা করলেন। তবু আমরা ভাইবোন ভয় পেয়েছিলাম। আমার মা সবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমার মা আমাদেরকে মামার বাড়িতে নিয়ে যান।

যখন আমরা শুনলাম যে গ্রাম থেকে মিলিটারি চলে গেছে তখন বাড়িতে ফিরে এলাম। এসে দেখি বাবা বাড়িতে নেই। তখন আমরা সবাই চিন্তিত যে, বাবা বুঝি আর বেঁচে নেই। কিছুক্ষণ পর বাবা বাড়িতে ফিরে এলেন, মাকে রান্না করতে বললেন। মা তখন রান্নাঘরে গিয়ে ভাত রান্না করে নিয়ে আসলেন। তারপর আমরা সবাই ভাত খেতে বসলাম। কিন্তু বাবা একটু দেরিতে বসেছিলেন। বাবা যখন খেতে বসলেন ঠিক সেই সময় বাবার এক পরিচিত লোক এসে বাবাকে ডেকে নিয়ে গেল। মা বললেন, ভাতগুলো খেয়ে যাও। কিন্তু বাবা মায়ের কথাটি রাখলেন না। বিকাল হয়ে গেল বাবা ফিরে এলেন না। আমরা সবাই আবারও চিন্তিত হয়ে গেলাম। এভাবে এক দিন, দুই দিন, তিন দিন পরও বাবা বাড়ি ফিরে এলেন না। বাড়িতে সবাই কান্নাকাটি করতে লাগল। তারপর দশ দিন পর জানতে পারলাম রাস্তার ধারে মিলিটারি সৈন্যরা তাকে গুলি করে হত্যা করেছিল। এই কাহিনী আমার চিরদিন মনে থাকবে।

সূত্র: জ-১০১৫২

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. অহিদুল ইসলাম	**মো. আব্দুল মান্নান সরকার**
দিগদারী নূনখাওয়া কেরামতিয়া দাখিল মাদ্রাসা	গ্রাম : গড় শান্তিপুর, ডাক : ভিতরবন্দ
৮ম শ্রেণি, রোল : ০৩	উপজেলা : নাগেশ্বরী, জেলা : কুড়িগ্রাম
	বয়স : ৮৫, সম্পর্ক : দাদু

কিবরিয়ার দুটি পা উড়ে যায়

১৯৭১ সালে ২৮ দিনের ট্রেনিং শেষ করি। লালমনিরহাট বর্ডারের ইন্ডিয়ান ঐতিহাসিক গিতালদহ পুরাতন রেলস্টেশন। তার পাশে আমরা ২০০ মুক্তিযোদ্ধা ইন্ডিয়ান অফিসার ক্যাপ্টেন উইলিয়ামের নেতৃত্ব তাঁবু গেড়ে যুদ্ধরত হলাম। প্রথম দিন আমি, মো. আব্দুল আউয়াল ডেমুলেশন কমান্ডার ও আমার তিনজন যোদ্ধাসহ লোহাকুচি হয়ে হেঁটে গিয়ে আদিতমারি রেলওয়ে ব্রিজ অপারেশন করি। লোহাকুচি পৌঁছার পর আদিতমারি ব্রিজ অপারেশন পর্যন্ত আলী চাচা নামক মধ্য বয়সী এক স্থানীয় সাহসী লোক আমাদেরকে সাহায্য করেন। উত্তর জনপদে মুক্তিযোদ্ধা কর্তৃক প্রথম সফল রেলওয়ে ব্রিজ অপারেশন এটিই।

ক্যাপ্টেন উইলিয়াম সাহেবের আদেশে সিরাজুল ভাই মাত্র ৩০ জন যোদ্ধা নিয়ে আমাকে তালতলা বর্ডারহাট এলাকায় ক্যাম্প স্থাপনের জন্য পাঠান। আমরা এসে ধনিগাগলা নেছর মুন্সির বাড়িতে প্রথম অবস্থান নিলাম। দুই-তিন দিন এলাকা চিনে নেয়ার পর মালডাঙ্গা ক্যাম্পে হানা দেয়ার জন্য প্ল্যান করছিলাম। এমন সময় খবর পেলাম হাজি সাইফুর রহমান (নাগেশ্বরী), রাজাকার জয়নাল মেকার ও পাকবাহিনীর কিছু সদস্য নিয়ে আমাদের দিকে আসছে। অমনি দল নিয়ে ছুটলাম সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য। কিন্তু সামনাসামনি হওয়ার অনেক আগেই জয়নাল মেকারের বাহিনী বল্লমপুর গিয়ে এক গর্ভবতীকে গুলি করে হত্যার পর নাগেশ্বরী চলে যায়। একটি ছোট দল নিয়ে আমরা রাত চারটার দিকে গোরক মণ্ডল নামে একটা ছোট্ট চরে গিয়ে উঠলাম। চরটি ছিল মোগলহাট ও গিতালদহ ভারত বাংলাদেশ সংযোগ। এপার-ওপার রেলওয়ে ব্রিজের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে। যুদ্ধ শুরুর আগে জনবসতি ছিল। এখন শূন্য। ভিটা বালুময়। কিছু ছিল কলা গাছ। উদ্দেশ্য ছিল মোঘলহাট পাকিস্তানি বেনিয়া বাহিনীর গতিবিধির খবর সংগ্রহ করা। তা আর হয়ে উঠল না। রামচরের রাজাকারের লোকজন আমাদের উপস্থিতি পাকিস্তানিদেরকে জানিয়ে দেয়।

বিকাল চারটা থেকে শুরু হয় লাঞ্চার ও আর্টিলারির শেলিং। লুকাবার মতো আশ্রয় আমাদের ছিল না। নিরুপায় হয়ে আমরা আল্লাহকে ডাকছিলাম। রাত হয় আমাদের সেখানে। রাত শেষ হওয়ার সাথেই আমরা রেহাই পেলাম। দুই যোদ্ধাকে রেয়ার হেড কোয়ার্টারে পাঠালাম। খবর নিয়ে রাত একটার সময় আমরা দুই দিক থেকে আক্রমণ করলাম। বেনিয়াদের ক্যাম্পে শুধু অস্ত্র নয়, বাংকারে গ্রেনেড ফেলে তাদেরকে হত্যা করা হয়।

তাতে আমরা সাথি হারিয়েছি তিনজন যোদ্ধাকে। ক্যাম্প কমান্ডারের নির্দেশে বর্তমান জেলার সিরাজুল ভাই (ভুরুঙ্গামারী) আর আকরাম ভাই বর্তমান কুড়িগ্রামে চাকরিরত আছেন। এদের সমন্বয়ে কুড়িগ্রাম জেলার ওই সময়ে একমাত্র মুক্ত এলাকা ফুলবাড়ীতে ক্যাম্প করার জন্য প্রায় ১০০ লোকের একটা দল নিয়ে বাজার থেকে দেড় কিলোমিটার উত্তরে এক বাড়িতে উঠলাম ভোর বেলা। সকালের নাস্তা প্রায় তৈরি, এমন সময় খবর এলো পাকিস্তানি বাহিনী কিছু সেনা নিয়ে কুলাঘাট পার হয়ে তাদের দোসর সাংবাদিক হক সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত এসেছে, আমরা যার যার মতো অস্ত্র হাতে নিয়ে সেদিকে ছুটে গেলাম।

আমাদের সাথে সহযোগিতা করলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল লতিফ (ফুলবাড়ী) মেম্বারের ৩০ জন আনসারের একটি দল। আমাদের খবর তাদের কানে পৌঁছার পরপরই তারা পালিয়ে যায়। তবে নয় মাস যুদ্ধে আর কোনো দিন পাকিস্তানি বাহিনী আর কুলাঘাট পার হওয়ার সাহস ও সুযোগ কোনোটাই পায়নি। ক্যাপ্টেন উইলিয়াম সাহেবের নির্দেশ মোতাবেক আমরা একটা ছোট্ট দল নিয়ে মোগলহাটের পাকিস্তানি বাহিনীকে আক্রমণের জন্য যাই।

আক্রমণ শেষে আমরা নদী পার হয়ে ক্যাম্পে ফেরার জন্য আসছিলাম। পথিমধ্যে এক জংলা জায়গায় সাথি যোদ্ধা ভোগডাঙ্গার কাজী জাকির হোসেন ও কিবরিয়া ভাই পাকিস্তানিদের পাতানো অ্যান্টি পার্সোনাল মাইনে পড়েছেন। জাকির ভাইয়ের এক পা এবং কিবরিয়ার দুইটি পা উড়ে যায়। কিবরিয়া মারা যায় জাকির ভাই আমার জানামতে কৃত্রিম পায়ের সাহায্যে চলেন। এখনো তিনি বেঁচে আছেন।

সূত্রঃ জ-৩৮৬০

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. ফরহাদ আলী	**আ. আউয়াল (অব.) সার্জেন্ট**
গাগলা মোক্তারকুটি সজিরন দাখিল মাদ্রাসা	গ্রাম : দক্ষিণ রামখানা,
দশম শ্রেণি, রোল : ০৩	নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
	বয়স : ৫৮

গামছা দিয়ে গা ঢেকে দিয়েছে

আমি চৌধুরীহাট কংগ্রেস অফিস থেকে ক্যাম্পে ফিরলাম। কলি মেম্বারের মা বললেন, দাদু ভাত খাও। বললাম, তাহের ভাইয়ের বাড়িতে যাব। আমার দলের কনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুল খালেককে সাথে নিয়ে তাহের ভাইয়ের বাড়ি যাচ্ছি দুপুরের খাবার খেতে। প্রায় দুটো বাজে। খালেক আমার বাম পাশে। আর মাত্র ৩-৪ গজ গেলেই তাহের ভাইয়ের বাড়ি। হঠাৎ কানে ফুট শব্দ এলো। সেকেন্ডের মধ্যে খালেককে বাম হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে রোয়া খেতে ফেলে দেই। আমি গড়িয়ে গড়িয়ে রোয়া খেতে পড়লাম। আর পেছনে মাত্র ৫০ গজ দূরে ঘাস খাওয়া অবস্থায় গরুটা ৫-৬ হাত ওপরে জাম্প করে মাটিতে পড়ে গেল। শুরু হলো ঝড়ের বেগে গুলি ও আর্টিলারির শেলিং। আমার যোদ্ধারাও লে-আউট দিল আলেপের তেপতি থেকে রাজেন মাস্টারের বাড়ি পর্যন্ত। জবাব দিতে থাকল খুব সাহসিকতার সঙ্গে। কিন্তু লক্ষ করছি আমি এবং খালেক যে জায়গায় গুলির আওয়াজ পেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম, ওখানের রাস্তার মাটি ছিঁড়ে যাচ্ছে তাদের ফায়ারে। অবশ্য আমরা ততক্ষণে সেখান থেকে গিয়ে যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধে যোগ দিয়েছি।

আজও মনে পড়ে সুডার কুটির চরের কথা। ১০০-র কিছু বেশি সৈনিক নিয়ে সেদিন সুডার কুটিতে হানাদার পাকিস্তানিরা আক্রমণ করে। তবে বলে রাখা ভালো গ্রামটা রাজাকারের। তার পরেও ঝড়ের মতো গুলির আওয়াজ শুনে আমি আমার কোম্পানির দিকে দৌড়ে আগালাম। দেখি পুরা রাজাকারের বাড়িতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। নির্বিচারে গুলি চালিয়ে এক গর্ভবতী মহিলাকে হত্যা করেছে। অনেক মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে। এলাকা দর্শনে মনে হয়েছিল আইয়ামে জাহেলিয়াত যুগের সব শেষ। জাহেলিয়াতি করে এই মাত্র কেউ এখান

থেকে চলে গেল। পরে কারণ হিসাবে জানলাম, পাকবাহিনীর সাথে যোগ দেওয়া এই এলাকার এক রাজাকার পাকবাহিনীর ক্যাম্প থেকে অস্ত্রসহ পালিয়েছে।

ক্যাম্প কমান্ডারের নির্দেশে রাত তিনটায় তিন টন আর্মি ট্রাকে উঠলাম। কোথায় যাব বলা হয়নি। ভোরে বুঝলাম ইন্ডিয়ান বর্ডার পার হয়ে সিতাই বর্ডারের বাংলাদেশে ঢুকলাম। হাঁটতে হাঁটতে খবর পেলাম পাকিস্তানি বাহিনী ভেলাবাড়ী থেকে চন্দন পাঠ এলাকায় ঢুকে গ্রামের জনসাধারণ ও মা-বোনদের ওপর নির্যাতন করছে। আমরা দৌড়ে এগুতে লাগলাম। সকাল ১০টায় সেখানে পৌঁছলাম। কিন্তু পশুরা তার আগেই সব শেষ করে দিয়ে গেছে। পড়ে আছে ১০-১১ বছরের এক মেয়ে শিশুর বিবস্ত্র লাশ। কেউ দয়া করে একটি গামছা দিয়ে গা ঢেকে দিয়েছে। লাশের কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

সূত্র: জ-৩৮৬৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. এমদাদুল হক	**মো. আবদুল আউয়াল কোম্পানি কমান্ডার**
গাগলা মোক্তার কুটি সজিরন দাখিল মাদ্রাসা	গ্রাম : দক্ষিণ রামখানা
দশম শ্রেণি, রোল : ৩	পোস্ট : নামারগঞ্জ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
	বয়স : ৫৮

বর্তমানে ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটেন

একাত্তরের একদিন বেলা দুইটার সময় ক্ষুধায় দুচোখে অন্ধকার দেখছি। ভাত তো দূরের কথা একটি রুটিও মেলেনি দুই দিন যাবত। প্রতি বাড়ি একজন করে লোক শুধু পাহারা দেয়। যখনই পাকসেনার হামলা আসে পালিয়ে যাই ভারতে, মা বোন সকলে সেখানে। এই সময়ে দুইজন মুক্তিযোদ্ধা এসে আমাদের গ্রামের সব লোককে ডেকে নিয়ে গেল গাগলা হাই স্কুলের সামনে। সেখানে গিয়ে দেখি ভারতের বহু শিখসেনা। যাওয়ামাত্র একটি করে রুটি ও একটি পেঁয়াজ খেতে দিল। তারপর যুবকদের বেছে নিয়ে বৃদ্ধ লোকগুলোকে যেতে বললো। প্রত্যেককে দুইটি করে রকেট বোমা দিল যা অবিকল কলার মোচার মতো দেখতে। তা নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যেতে বলল নেওয়াশি পার হয়ে স্কুলের হাট এক ছনক্ষেতের মাঝে। আমাদের অনেক পিছে আসছে ভারতের শিখসেনা। তারা আমাদের নিকট পৌঁছার সাথে সাথে নাগেশ্বরী থেকে পাকসেনারা বোমা মারা শুরু করে। তখন আমরা সবাই মাটিতে শুয়ে পড়ি এবং ক্রোলিং করে এক-দেড়শ গজ দূরে দূরে ছোটাছুটি করি। কিছুক্ষণ পর বোমা বন্ধ হলে শিখ সেনারা বিকল্প রাস্তায় আমাদেরকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার জন্য একজন মুক্তিযোদ্ধাকে বলে। তার নাম আব্দুল খালেক। বাড়ি গাগলা বাজার। আমাদেরকে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তিনি সদর রাস্তায় আবার নিজ তাঁবু পাখির হাটে যাওয়ার সময় জয় মঙ্গল (বর্তমানে এগারো মাথা) সদর রাস্তায় মাইন বাস্ট হয়ে ডান পা হারান। তাকে তৎক্ষণাৎ কোচবিহার হাসপাতালে নেয়া হয়।

বর্তমানে তিনি ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটেন। সরকারি কোনো প্রকারের ভাতা না পাওয়ায় তার পরিবার খুবই কষ্টে জীবনযাপন করছে।

সংগ্রহকারী
মো. জাইদুল ইসলাম তালুকদার
গাগলা মোক্তার কুটি সজিরন দাখিল মাদ্রাসা
দশম শ্রেণি, রোল : ১

বর্ণনাকারী
মো. আনোয়ার হোসেন তালুকদার
ধনী গাগলা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
সম্পর্ক : বাবা, বয়স : ৪৮

স্তব্ধ হয়ে যায় ৩৩ জনের তাজা প্রাণ

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকেই হঠাৎ করে পাকসেনারা আমাদের গ্রামে ঢুকে তাণ্ডবলীলা শুরু করে। জ্বালাও-পোড়াও এবং মানুষ মারার জঘন্য কার্যকলাপ চালায়। সেই দিনেই আমার গ্রামের জব্বার আলী ও ভ্যাদাই ব্যাপারিকে নির্মমভাবে হত্যা করে চলে যায়। স্বচক্ষে এসব দৃশ্য দেখে আমার মনে বিদ্রোহের ছাপ পড়ে। মনে মনে কল্পনা করতে থাকি, কীভাবে আমি পাকসেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে পারি। তখন আমার বয়স মাত্র পনেরো-ষোল বছর। যেদিন আমি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাই সেদিন আমার পাশের গ্রামের অর্থাৎ গোপালপুর বোর্ডের হাটের আচ্ছা দেওয়ানীকে ঘরের মধ্যে বেঁধে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারে। পরে আমার বয়সী আরো দুইজনকে সাথে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিংয়ের জন্য ভারতের বামনহাটে যাই। সেখানে আমাদেরকে সনদ দেয় যে, ছেলে তিনটিকে মুক্তিযোদ্ধাতে ভর্তির সুপারিশ করা হলো। আমাদেরকে ভারতের দিনহাটাতে যেতে বলে। দিনহাটা গিয়ে আমরা সন্ত্রাসীদের হাতে পড়ি। যা কিছু সম্বল ছিল তা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তিনজনের মধ্যে শুধু আমার কাছে এক টাকা চার আনা ছিল। এই সম্বল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পরে সেই পয়সা দিয়ে এক কেজি ছোলাবুট কিনে ভেজে নিয়ে দিনহাটা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যাই। সেখানে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধার অফিস খুঁজে পাই। সেখানে আমদেরকে বলা হয় কুচবিহার সুভাষ পল্লী ক্যাম্পে যেতে হবে এবং সনদ দেয় যে, তৈয়ব ভাই ছেলে তিনটিকে মুক্তিযুদ্ধে ভর্তি করুন। এই সনদ নিয়ে দিনহাটা রেলস্টেশনে গিয়ে সেই ছোলাবুটের অর্ধেক তিনজন খেয়ে পানি পান করে রাতের বেলায় গাড়িতে উঠি। সারারাত গাড়ি চলার পর কুচবিহারে পৌঁছি। তারপর সুভাষ পলী ক্যাম্প খুঁজে পাই এবং আমাদেরকে মুক্তিযোদ্ধায় ভর্তি করে নেয়।

সেখানে এক রাত অবস্থানের পর সকালের নাস্তা করেই ভারতের সেনা ট্রাকে করে তাপুরহাট নামক পাহাড়ে নিয়ে যায় এবং আমরাই প্রথম সেই ক্যাম্প স্থাপনকারী। সেখানে ১৪ দিন থাকার পর আমরা জলপাইগুড়ি মুরতি ক্যাম্পে যাই। সাথি দুইজন কখন যে পালিয়ে বাড়িতে চলে গেছে আমি বুঝতেই পারিনি। সেখানে ২৮ দিন ট্রেনিংয়ের পর অস্ত্র ও গোলা-বারুদ দিয়ে আমাদেরকে গিতালদহে পাঠানো হয়। ক্যাপ্টেন দেলোয়ার সাহেবের নেতৃত্বে গিতালদহে এসে দিনে রাত্রে বিভিন্ন ধরনের অপারেশনে অংশগ্রহণ করি। সেই ক্যাম্প থেকেই আমরা বিশেষ দল পুনরায় ট্রেনিং গ্রহণ করি এবং মহড়া দিয়ে অপারেশনের উদ্দেশ্যে চলে যাই মোগলহাটের একটি এলাকায়। সংখ্যায় ছিলাম ৩৫ জন। সেখানে আমরা অপারেশন করি দিনের বেলায়। পাকসেনারা সেখানে থাকত। কিন্তু রাত্রের বেলায় সম্ভবত গিরাই নদী পার হয়ে অপর প্রান্তে অবস্থান নিত। এই দিন পর্যবেক্ষণ দলের ভুলে আমরা আগেই পরিকল্পনামতো রাত্রি ১২টার সময় অপারেশন কমান্ডারের আদেশ অনুযায়ী পজিশন নিই। আমরা পাকসেনাদের লক্ষ্য করে গুলি আরম্ভ করি। সঙ্গে সঙ্গে ডানপার্শ্ব থেকে পাকসেনাদের মেশিনগানের গুলিতে স্তব্ধ হয়ে যায় ৩৩ জনের প্রাণ। শুধু চিৎকারের শব্দ শুনতে পাই এবং বাঁচাও বাঁচাও শব্দ কানে আসে। আমার বাম পায়ে দুইটা গুলি লাগে। ভাগ্যক্রমে মাংসের মধ্যে গুলি লাগে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হারিয়ে গেল ৩৩ জনের তাজা প্রাণ। শহিদ হয়ে গেল বীর মুক্তিযোদ্ধারা, শুধু বেঁচে রইলাম আমি এবং সেলিম নামক একজন পুলিশ সিপাহি। সেই পুলিশ সিপাহির গায়ে ১৩টি গুলি বিদ্ধ হয়। আমার ওপরে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার লাশ পড়ে থাকে। কয়েক মিনিট পরেই নদী পার হয়ে পাকসেনারা এসে তল্লাশি এবং বেয়নেট চার্জ করে, বড় ধরনের অস্ত্রগুলো আর ওয়্যারলেস সেট নিয়ে যায়। এ সময় আমি মরার ভান করে লাশের নিচে শুয়ে থাকি। পরে নিশ্চিত

হই পাকসেনারা চলে গেছে। তারপর লাশের নিচ থেকে বের হয়ে প্রথমে নিজেই নিজের গায়ের জামা ও গামছা দিয়ে পা ব্যান্ডেজ করি। তারপর সেলিমের কাছে ক্রলিং করে যাই। সেই নদীর কিনারায় কাচারের নিচে অবস্থান গ্রহণ করি। তারপর আমাদের আগেই মুক্তিযোদ্ধা উদ্ধারকারী দল এবং স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় রেখে যাওয়া বাকি অস্ত্র এবং লাশসহ গিদালদহের ক্যাম্পে নিয়ে আসে এবং আমাদেরকে হাসপাতালে প্রেরণ করে। সেখানে এক মাস চিকিৎসার পর এক পাটুন ইপিআর-এর মর্টার সাপোর্ট হিসেবে কুলাঘাটে প্রেরণ করে।

পরবর্তী সময়ে নেওয়াশীতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। যার বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে। নেওয়াশী থেকে গাগলায় এবং নাগেশ্বরীতে বিভিন্ন স্থানে অপারেশনে যোগ দেই। গাগলা থেকে আবারো ফুলবাড়ীতে অর্থাৎ কুলাঘাটের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। সেখানে পাকসেনাদের কামানের গোলাতে একজন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন। পাকসেনাদের বিরুদ্ধে তখন ভারতীয় সেনাবাহিনী যুদ্ধে যোগ দেয়। কুলাঘাট থেকে যখন আমরা লালমনিরহাট অভিমুখে অ্যাডভান্স করি তখন ভারতের কামানের গোলা লালমনিরহাটের দিকে নিক্ষেপ করতে থাকে এবং আমরা পথ বুঝে যাত্রা শুরু করি। তৎক্ষণাৎ পুলের সামনে দেখতে পাই কয়েকটি পাকসেনার মরদেহ খণ্ড খণ্ড অবস্থায় পড়ে আছে। আরেকটি বাংকারে গিয়ে দেখি একটি যুবতী মহিলা উলঙ্গ অবস্থায় মরে আছে। আমরা লালমনিরহাটের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। আর পাকসেনারা রংপুরের দিকে পশ্চাদাপসারণ করতে থাকে। আমরা লালমনিরহাটে অবস্থান নিই। লালমনিরহাটে পাঁচ দিন থাকার পর তিস্তাব্রিজ পার হয়ে হেঁটে হারাগাছ এলাকায় প্রবেশ করি। হারাগাছে এক রাত অবস্থানের পর অর্থাৎ ১৫ ডিসেম্বর রংপুর অভিমুখে যাত্রা শুরু করি। সেদিন ছিল ১৬ ডিসেম্বর। রেডিওতে শুনতে পাই পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করেছে। আনন্দ উল্লাসের মধ্যে রংপুর শহরে প্রবেশ করি। স্বাধীন বাংলার পতাকা হাতে নিয়ে আনন্দে আকাশের দিকে গোলাগুলি করি এবং আমরা অর্জন করি স্বাধীন বাংলাদেশ। আনন্দ উল্লাসের মধ্যে দিয়েই কেটে গেল দিনটা। পরের দিন আদেশ মতো রংপুর মেডিকেল কলেজে সকল মুক্তিযোদ্ধা সমবেত হই। তারপর আমরা অস্ত্র গোলাবারুদ জমা করে বিশ্রাম করতে লাগলাম। কয়েকদিন পর গ্রুপভিত্তিক ১০ দিনের ছুটিতে বাড়ি এলাম। স্বজনেরা আমাকে তাদের মাঝে ফিরে পেয়ে জড়িয়ে কান্নাকাটি করল। ১০ দিন পরে আবার রংপুর মেডিকেল কলেজে যোগদান করলাম। পরের দিনেই সেনা অফিসারগণ এসে বাছাই করে ১৭৫ জনকে সেনাবহিনীতে ভর্তি করে রংপুর সেনানিবাসে নিয়ে গেল। তার মধ্যে আমিও একজন। আমার জীবনে আবারো সুযোগ এলো দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার । সুদীর্ঘ ২৯ বছর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থেকে গত ০৩.০৪.২০০০ তারিখে সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার পদপর্যাদায় অবসর গ্রহণ করি। বর্তমানে আমার স্ত্রী, দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে নিয়ে জীবনযাপন করছি।

সূত্র: জ- ৭৬২৮

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
শারমিন আক্তার শাপলা	**দেলওয়ার হোসেন**
জাগরণী বহুমুখী বালিকা বিদ্যাবিথী উচ্চ বিদ্যালয়	ধনী পাগলা,নাগেশ্বরী
৯ম শ্রেণি, রোল : ৪৩	

জাতি ধর্ম মান কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর দিকে পাকহানাদার বাহিনী কুড়িগ্রাম মহকুমা শহরে এসে নারকীয় কাণ্ড কারখানা শুরু করে। শত শত লোককে হত্যা করা ছাড়াও তারা বিভিন্ন অফিস-আদালত, বাড়িঘর ও দোকানপাট জ্বালিয়ে দেয়। এরপর থেকে উত্তর ধরলাকে রক্ষার শপথ নিয়ে মুক্তিফৌজ ধরলার উত্তর-পূর্ব পার্শ্বে অবস্থান নেয় এবং প্রায় তিন মাস পর্যন্ত তারা উত্তর ধরলাকে রক্ষায় সম্পূর্ণভাবে সমর্থ হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ভিতরবন্দ নিবাসী রাজাকার শামসুল হক খন্দকার ও তার ছোট ভাই মোজাম্মেল হক খন্দকারের কূটকৌশলে পাকবাহিনী ধরলা পাড়ি দিতে সক্ষম হয়। যতদূর মনে পড়ে সময়টা জুন '৭১-এর মাঝামাঝি।

আছরের নামাজ পড়ে বাড়িতে চায়ের আসরে বসেছি বাবা-মা ও ভাই-বোনদের সঙ্গে। হঠাৎ হরিহর বর্মণ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আব্বাকে লক্ষ্য করে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, দাদা বিহারি পার হয়েছে, এখন কী হবে দাদা? বলতে বলতে উর্ধ্বশ্বাসে এক রকম দৌড় দিল তার বাড়ির দিকে। হরিহর দৌড় দিল ঠিকই কিন্তু হতভম্ব করে দিল আমাদের সবাইকে। অশ্রুসজল চোখে চেয়ে রইলাম আব্বার মুখের দিকে। আব্বা নির্বাক নিরুত্তর। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পাড়ার অনেকেই এলেন আব্বার কাছে। প্রশ্ন একটাই, এখন কী হবে, কী করণীয়। আব্বা এতক্ষণে মুখ খুললেন। শান্তস্বরে সবাইকে বললেন, পালাও শিগগির, যার যার মতো সরে পড়ো।

সবাই চলে গেল। আমি ও আব্বা জিনিসপত্র গোছাতে লাগলাম। মাগরিবের নামাজ কারোরই পড়া হলো না, জানমাল বাঁচাতে সবাই মহাব্যস্ত। স্থির হলো আমরা যাব প্রায় তিন কি.মি. পূর্ব দিকে এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে। বাড়িটি দুধকুমার নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভর্তি দুটি বস্তা বাড়ির চাকর সিদ্দীক মিয়াসহ মাথায় নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দিলাম। রাস্তায় উঠে দেখি পিঁপড়ের সারির মতো মানুষ চলছে। সবারই একই অবস্থা। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম সেই বাড়িতে।

মনে হলো বাড়ির মালিক আমাদেরই অপেক্ষায় ছিলেন। মালপত্র রাখার স্থান দেখিয়ে দিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি যাও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে এসো। কিন্তু ইতোমধ্যেই সেখানে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। এতো লোক ওই বাড়িতে কোথায় কীভাবে থাকবে। বিশেষ করে মেয়েদের কান্নাকাটি আমাকে দারুণভাবে ব্যথিত করে তুলল। সবাই নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে ছুটছে অজানা এক আশঙ্কায়। বিপদে মানুষ সাহস ও শক্তি হারায় শুনেছি কিন্তু ওই দিন একজন দুর্বল মানুষও অতি ভারী বোঝা বহনে সক্ষম হয়ে যান ও জানমাল বাঁচানোর তাগিদে সম্পূর্ণ অজানা অচেনা নারী পুরুষও সেদিন একই সঙ্গে গাদাগাদি করে রাত্রি যাপন করেছিল। পরম আত্মীয়ের ন্যায় সেদিন শত্রু-মিত্র, নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম কোনো কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সকলেই ছিল যেন একই পরিবারভুক্ত, একই ধর্মে দীক্ষিত সবাই তাড়িত-বিতাড়িত। সবাই মিত্র, শত্রু শুধু পাকহানাদার বাহিনী।

সূত্র: জ- ৫৬০৯

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
সরাবুন তহুরা	**সেকেন্দার আলী**
কালীগঞ্জ মহাবিদ্যালয়	গ্রা : মাধাইখাল, থা: নাগেশ্বরী, জে : কুড়িগ্রাম
মানবিক বিভাগ, একাদশ শ্রেণি	বয়স : ৫০ বছর

অন্ধ হয়ে গেল আমার একটি চোখ

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ। যুদ্ধ শুরু হওয়ার ৪-৫ মাস পর্যন্ত কুড়িগ্রাম জেলাশহর হতে দক্ষিণ দিকে যুদ্ধ চলে। জুলাই মাসের দিকে কুড়িগ্রাম জেলাধীন নাগেশ্বরী থানার অন্তর্গত ভিতরবন্দ এলাকার সামছুল হক খন্দকার নামের এক ব্যক্তি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে ধরলা নদী পার করে নিয়ে আসে। তখন থেকে শুরু হয় উত্তর ধরলার সব রকমের মানুষের ওপর অত্যাচার, নিপীড়ন আর জুলুম।

আমার বয়স তখন নয় বছর। ওই সময় আমি এলাকার লোকদের জীবন রক্ষার্থে পাহারাদার হিসাবে কাজ করেছি। হানাদার বাহিনী যখন আমাদের এলাকায় আসা শুরু করে তখন আমি চিৎকার করে এলাকাবাসীকে বলি, আপনারা পালিয়ে যান। ওই আসছে হানাদার বাহিনী। এভাবে অনেকদিন চলে যায়। মুক্তিফৌজ আমার কাছে আসে এবং খবর নেয় হানাদার বাহিনী কোথায় আছে। এভাবে সংবাদ আদান-প্রদান করতে করতে একদিন শনিবার সকাল ১১টার দিকে নাগেশ্বরী থেকে প্রায় ১৫০ জনের মতো হানাদার আসছে দেখে আমি চিৎকার করে বলি, পালাও পালাও বিহারি আসছে। আমার কথা শুনে এলাকার সব পুরুষ-মহিলা, আমার মা-বাবা, ভাইবোন, দাদা-দাদি, চাচা-চাচি প্রাণের ভয়ে বাড়ির পেছনের পাট ও ধানক্ষেতে লুকায়। আমিও তাদের সঙ্গে লুকানোর জন্য

গিয়েছিলাম। তখন আমার মা বললেন, তোমার বাবার সাথেই যাও, আমি বাবাকে খুঁজতে গিয়ে দেখি বাবা নেই, মাকে খুঁজতে এসে দেখি মাও নেই। এমন সময় আমি ভয়ে অস্থির। এমতাবস্থায় নদী পার হয়ে এক বাড়িতে লুকাই। পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের বাড়ি পার হয়ে গ্রামের শেষ মাথায় এক মুচি বাড়ি হতে শুরু করে পুরো গ্রাম পুড়িয়ে দেয়। ওই সময় আমার এক চাচা মসজিদে কোরআন পড়ছিলেন। ওই অবস্থায় তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে মাথায় গুলির বাক্স তুলে দেয়। পরে গ্রামের আজম আলী সরকার নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। তখন তার তিন পুত্র জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল। বাড়িতে আগুন লাগা দেখে তারা দৌড়ে আসে বাড়ির মাল রক্ষার জন্য। তৎক্ষণাৎ তাদেরকেও ধরে নেয়। একইভাবে ওই গ্রামও সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দেয়। চার জনকে গ্রেফতার করে টুটা পাইকর নামে এক ব্রিজের নিচে লাইন করে একটি গুলিতে তাদেরকে হত্যা করে। এর একপর্যায়ে মুক্তিবাহিনীর একটি দল আমার কাছে আসে এবং পাকবাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে। দুই দলের মধ্যে ৪-৫ ঘণ্টা প্রবল যুদ্ধ হয়। এই গোলাগুলি চলা অবস্থায় পাকবাহিনীর একটি গুলি আমার ডান চোখে লাগে এবং তা ছেদ করে পেছন দিকে বের হয়। আমি তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ি। আমার জ্ঞান ফেরার পর দেখি আমি নাগেশ্বরীর কাছাকাছি চামটার পাড় নামক গ্রামে এক ডাক্তারের বাড়িতে। গুলি লাগার তিনদিন পর পর্যন্ত ভীষণ যুদ্ধ হয়। পুরো এলাকার লোক গ্রামছাড়া হয়। এমন সময় আমার মা-বাবা আমাদের গ্রাম হতে প্রায় দশ মাইল পশ্চিমে এক আত্মীয়ের বাড়িতে যায় এবং সেখানে চিকিৎসা করে আমি সুস্থ হয়ে উঠি। তারপর দেশ শান্ত হওয়ার পর আমরা বাড়িতে ফিরে আসি এবং দেখতে পাই আমাদের বাড়িও পুড়িয়ে দিয়েছে হানাদার বাহিনী। তারপর আমরা পুনরায় ছোট ছোট ঘর তুলে জীবন শুরু করি। কয়েকদিন যাওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান সরকার শহিদ ব্যক্তিদেরকে ১০০০ টাকা এবং আহত ব্যক্তিদেরকে ৫০০ টাকা করে প্রদান করেন। ওই সময় আমিও ৫০০ টাকা পাই সেই টাকা দিয়ে চোখের চিকিৎসা করান আমার বাবা-মা। তখন হতে এ পর্যন্ত আমার এক চোখ অন্ধ। আমি ওই চোখ দিয়ে আর কোনোদিন পৃথিবীর আলো দেখতে পাব না।

সূত্র: জ-৩০২৮

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. বিলাল হোসাইন	**আ. রহমান মাস্টার**
নেওয়াশী মহাবিদ্যালয়	সুখাতী গিড়াইপাড় প্রাথমিক বিদ্যালয়
একাদশ শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ, রোল : ৫	বয়স : ৪৭